জুলাই ২০২৫ ■ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩২

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জুলাই

গণ-অভ্যুত্থান

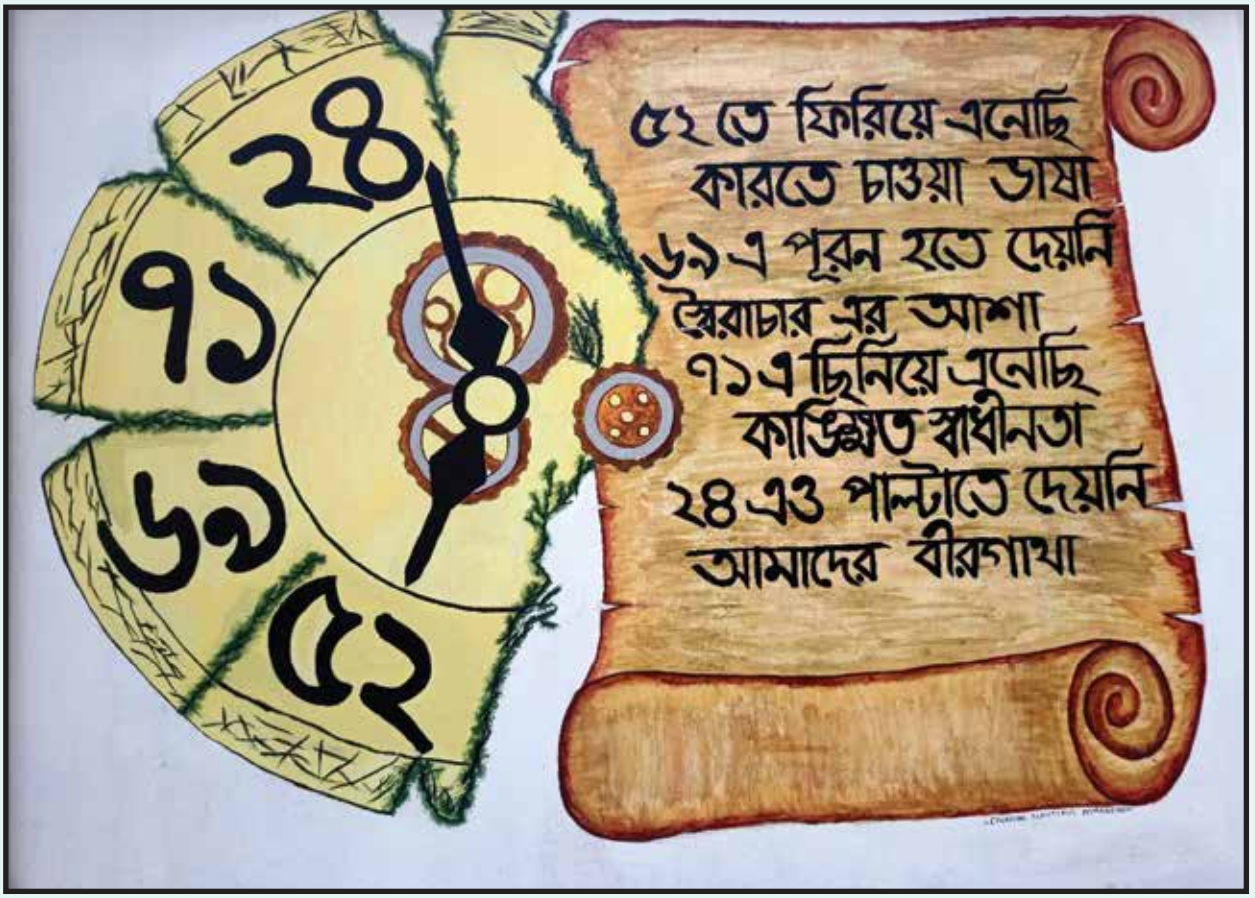
৫২ তে ফিরিয়ে এনেছি
কারতে চাওয়া ভাষা
৬৯ এ পূরন হতে দেয়নি
স্বৈরাচার এর আশা
৭১ এ ছিনিয়ে এনেছি
কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা
২৪ এও পাল্টাতে দেয়নি
আমাদের বীরগাথা
২৪
৭১
৬৯
৫২

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জুলাই ২০২৫ ❑ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩২

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ২রা জুন ২০২৫ ঢাকায় তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন—পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বছর পেরিয়ে এসেছে নতুন জুলাই। সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দানা বাঁধে গত বছরের এই জুলাইয়ে। জুলাই মাসেই রংপুরের তরুণপ্রাণ আবু সাঈদের পথ ধরে শিক্ষার্থী, শ্রমিক, মজুরসহ শত শত মানুষ শাসকের বন্দুকের নলের সামনে বুক পেতে দাঁড়ানোর নজিরবিহীন সাহস দেখান। বিরলতম এই আত্মত্যাগে বিজয়ী হয় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান। জনজোয়ারে ভেসে যায় ক্ষমতার দম্ভ। আসে নতুন ভোর, সৃষ্টি হয় নতুন সম্ভাবনা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে বাজেট প্রণয়নে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো বিবেচনা করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম বাজেটে ইতিবাচকভাবে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সরকার জাতির জন্য সর্বোত্তম কল্যাণকর খাতে অর্থ বরাদ্দ করতে সচেষ্ট। অপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থ ব্যয় কমানোর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। যে-কোনো বাজেটের তুলনায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেট পূর্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেও অনেকটাই বাস্তবসম্মত– এ বিষয়ে এবারের জুলাই সংখ্যায় আছে বিশেষ নিবন্ধ।

পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ১৯২৫ সালের লেখা অমর এ কবিতার শতবর্ষ বাংলা সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় *কল্লোল* পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায়। 'কবর' কবিতা প্রকাশিত হলে সেটি মনোযোগ আকর্ষণ করে দীনেশ চন্দ্র সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। 'কবর' কবিতা তৎকালীন সমাজের চিত্র তুলে ধরেছে। কবিতাটির শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এর সাহিত্যিক গুরুত্ব তুলে ধরেছে *সচিত্র বাংলাদেশ*।

গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে যখন প্রকৃতি জ্বলেপুড়ে একাকার, তখনই প্রকৃতিতে শীতল পরশ নিয়ে আসে বর্ষা। বর্ষাকালে প্রকৃতি যেন ফিরে পায় নবজীবন। চলাচলে অসুবিধা হলেও বর্ষা আমাদের মনে প্রশান্তি নিয়ে হাজির হয়। বর্ষাকালে গ্রামবাংলার প্রকৃতি গাঢ় সবুজ হয়ে ওঠে। দেখা দেয় চারদিকে সবুজের সমারোহ। গ্রামবাংলার প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে ওঠে বর্ষাকালে। আকাশে কালো মেঘ ও সূর্যের লুকোচুরি খেলা, টিনের চালের বৃষ্টির ঝুমঝুম শব্দ যে কাউকে করে তোলে উদাস, রাতের অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক মানব মনে তৈরি করে অপূর্ব এক রোমাঞ্চ। এবারের সংখ্যায় বর্ষার এই অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে আছে নিবন্ধ ও কবিতা।

এছাড়া, এ সংখ্যায় রয়েছে অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা। আশা করি, এ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/গ্রন্থ আলোচনা/স্মৃতিচারণ/সংবাদ প্রতিবেদন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক ওয়ারিশান
ফারুক ওয়াসিফ ৪

রক্তে রাঙা জুলাই বিপ্লবঃ নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন
জাকির আবু জাফর ৭

জুলাইয়ের স্মৃতি ধারণে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রয়াস
মো. মামুন অর রশিদ ১০

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট
এম এ খালেক ১৩

রয়েল বেঙ্গল টাইগার
অধ্যাপক ড. আ ন ম আমিনুর রহমান ১৭

মির্জা নূরুল হুদার জীবন ও কালঃ একটি পর্যালোচনা
ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ ২০

সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তি
মো. নাইমুল ইসলাম খান অনিক ২৩

ডায়াবেটিস রোগীদের মুখের স্বাস্থ্য সমস্যা
অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী ২৬

'কবর' কবিতার শতবর্ষ
ড. মোহাম্মদ আলী খান ২৮

বর্ষার রূপ
ড. আবদুল আলীম তালুকদার ৩১

কবিতার শতবর্ষঃ প্রেক্ষিত জসীমউদ্‌দীনের 'কবর'
রফিকুর রশীদ ৩৩

বাংলা সাহিত্যে বর্ষাকাল
মনজুর-ই-আলম ফিরোজী ৩৬

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি কায়কোবাদ
আলম শামস ৩৯

বর্ষার পদাবলি
ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ ৪১

আগুনের পরশমণি চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত সমাজব্যবস্থা
বিনয় দত্ত ৪৪

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) কার্যক্রম ৪৭

জনমিতিক লভ্যাংশে বাংলাদেশ
শারমিন ইসলাম ৪৯

বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুব দক্ষতা
অনুপ বিশ্বাস ৫১

গল্পঃ

পল্লিকবির 'কবর' ঘিরে
সুজন বড়ুয়া ৫৩

তিরিশ বছর পর
আবদুল গাফ্‌ফার সিকদার ৫৮

কবিতা ৫৭, ৬২-৬৩
তানিয়া খান, হানিফ রাজা, ফরিদ সাইদ, তানিয়া রহমান
গোবিন্দলাল সরকার, সেহাঙ্গল বিপ্লব, আবু জাফর আবদুল্লাহ্
জসীম উদ্দীন মুহম্মদ, চন্দনকৃষ্ণ পাল
মিতা চক্রবর্তী, সমীরণ বড়ুয়া

শ্রদ্ধাঞ্জলি
চলে গেলেন ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খান ৬৪

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক ওয়ারিশান

ফারুক ওয়াসিফ

পৃথিবীর সূর্যকে ঘুরে আসতে লাগে একটা বছর। ২০২৪ সালের ৩৬ জুলাই থেকে আমরাও পেরিয়ে এসেছি আস্ত একটা বছর। কিন্তু জুলাইয়ের শহিদ সূর্য সন্তানদের কেন্দ্রে রেখে কি এই পথ হাঁটতে পেরেছি আমরা? গত বছরের সেপ্টেম্বরেও জুলাইয়ের অনেক শহিদের লাশ বেওয়ারিশ পড়ে ছিল। এই সংখ্যা ১২০ জনেরও বেশি। মনের ভেতরের অমোঘ প্রশ্নটা তাই ঘাই মেরে জেগে ওঠে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানও কি একসময় বেওয়ারিশ হয়ে যাবে?

দুটি কাজ জুলাইয়ের উত্তরাধিকারের জন্য বিপজ্জনক– অর্জনের মালিকানা দখল কিংবা সংগ্রামকে বেওয়ারিশ করে দেওয়া। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার বেলায় এমন সর্বনাশ ঘটেছিল। বাহাত্তর সালেই আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের মালিকানা দখল করে নিলো। ইতিহাসের মালিকানা দখল ফ্যাসিবাদের মূল খাসলতগুলোর একটি। এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। সাধারণ ঘরের সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা মারাত্মক আশাহীনতা নিয়ে দূরে সরে গেলেন। তাতেই একশ্রেণির মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসায়ীর সামনে সুযোগ তৈরি হলো অর্জনকে বেহাত করার। জুলাইয়ে জন্ম হয়েছে যে বাংলাদেশের, সেই বাংলাদেশের এ ব্যাপারে সজাগ থাকা জরুরি।

আমরা দেখেছি, একাত্তর কীভাবে বাংলাদেশ বিপ্লব নাম থেকে মুক্তিযুদ্ধ হলো। তারপর হলো স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং অবশেষে স্বাধীনতা সংগ্রাম। কোনো একটি বিজয়ের ঘটনা আপনাআপনি বিপ্লব হয় না। তাকে তখনই বিপ্লব বলা যায়, যখন দৃশ্যমান বিজয়ের পরেও লড়াই জারি থাকে, লড়াইয়ের দাবিদাওয়াগুলো একে একে অর্জিত হয় এবং ধারাবাহিক সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার পরে দেশ ও মানুষের অবস্থার মৌলিক রদবদল ঘটে। জুলাই এখনো উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, নানান বাঁকে এসে নানান শত্রু মোকাবিলা করে টিকে থাকছে। কোনো কোনো সময় মাথা উঁচু করে টিকে থাকাই বিজয়। এই টিকে থাকাকে সাফল্য বললে ইতিহাস হাসবে।

জুলাই নিয়ে নানান বয়ানের খেলাধুলাও চলছে। ভয় হয়, বেশি খেলা চালাতে চালাতে শেষমেষ খেলাটাই না ধুলা হয়ে যায়। ইতোমধ্যে একটা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে জুলাই গণহত্যা নিয়ে প্রচারিত তথ্যচিত্র দেখে আমার মতো অনেকেই বিব্রত। সেখানে পলাতক শেখ হাসিনার গণহত্যার দায় প্রমাণ হতে দেখে আমরা অবশ্যই আশ্বস্ত হয়েছি। পাশাপাশি বিব্রত হয়েছি জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার মধ্যে থেকে একটি ঘরানার ছাত্রনেতাকে জুলাই অভ্যুত্থানের মুখপাত্র বলে হাজির করা দেখে। ঐ ছাত্রনেতা এবং তার সংগঠনের অবদান মোটেই কম ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তারাই প্রতিরোধের জোগান চালিয়ে গেছেন। কিন্তু অভ্যুত্থানের শিরদাঁড়া হিসেবে, আন্দোলনের সূচনা এবং তার জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠা করায় যারা দিশারি হিসেবে সেসময় দেশের সামনে হাজির ছিলেন, তাদের কেন বাদ দেওয়া হলো?

আওয়ামী লীগ এবং তাদের বৈদেশিক নাগরেরা বার বার বলতে চেয়েছে যে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছিল ডানপন্থিদের ষড়যন্ত্র। জুলাই অভ্যুত্থানে কে ছিল না? ডান ছিল, বাম ছিল, মধ্য ছিল।

যারা এইসব মতবাদিক ফেরকায় পড়তে চান না, তারাই তো ছিলেন বেশি। জুলাইয়ের মূল ছাত্রনেতারা তখনও কোনো

রাজনৈতিক গঠনে আসেননি, নিজেদের চিন্তাধারাকেও মতবাদের আকার দেননি। তাদের কি ডানপন্থি বলা যাবে? কিংবা দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলটিকে কি ডানপন্থি বলে চালানো সম্ভব? মনে রাখা ভালো, ছাত্রনেতাদের মধ্যে যেমন, তেমনি ফ্যাসিবাদের আমলে নিপীড়িতদের মধ্যে অগ্রগণ্য ঐ দলটির শীর্ষেও তো ছিলেন সাবেক বামপন্থিরা। মাদ্রাসাছাত্ররা বিপুল আকারে ছিল, তেমনি ছিল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালেয়ের ছেলেমেয়েরাও। আকাশের অনেক রং। কিন্তু সব বাদ দিয়ে কেবল একটি রং বা একটি ধারাকেই মূল বলে দেখানো রংকানা আচরণ। তেমনি খণ্ডকে সমগ্র বলে ভাবানোও গুরুতর দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা, রসিকতা করে যাকে হস্তিকানা বলা হয়ে থাকে।

জুলাইয়ে কোনো মতবাদিক ব্যাপার ছিল না। মতবাদিক বিবাদ বা কিছু দায়িত্বহীনতার ঝাণ্ডা ওড়ানোর কাজটি হয়েছে বরং পরে সেসবও জুলাইয়ের মূলধারার অংশ ছিল না। জুলাই ঐসব কূটকাচালি দঙ্গলের উত্তরাধিকার বহন করবে না।

বদরুদ্দীন উমর ঠিক কথাই বলেন বেশির ভাগ সময়। জুলাই নিয়েও তার অন্তর্দৃষ্টি মারাত্মক। তিনি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে বাংলাদেশের তো বটেই উপমহাদেশের সকল ঐতিহাসিক আন্দোলন-অভ্যুত্থানের চাইতে ব্যাপক বলেছিলেন। বলেছিলেন এর শক্তি ও বিস্তার পাকিস্তান আমলে আইয়ুবের সেনাশাসনের বিরুদ্ধে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই সাফল্য জনতার, তবে জনতার দফাদার হিসেবে ছাত্রনেতৃত্বকে অবশ্যই অভিবাদন জানাতে হয়।

দ্বিতীয় কৃতজ্ঞতা এই জাতির প্রতি, এই জমিনের প্রতি। এই দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ এক ভাষায় কথা বলে। এই দেশের ৯০ ভাগ মানুষের ধর্মবিশ্বাস একই। এমনকি যারা বাঙালি ও মুসলমানও নন, তাদের জীবনবোধ, পারিবারিক মূলবোধ, খাদ্যাভ্যাস এবং অর্থনৈতিক প্রণালির মূল দিকগুলো প্রায় একইরকম। এই জন্যই এই বাংলা সমতলে, বাংলা সাগর তীরের মানুষেরা মরলে একসাথে মরি, লড়লে একসাথেই লড়ি। এটা আমাদের বিরাট কালচারাল ক্যাপিটাল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে এর যে মানবিক প্রকাশ দেখা গিয়েছে, তা ফ্যাসিবাদ ও তার মিত্রদের জন্য এক বিপন্ন বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। এ জন্যই তাদের পক্ষে নতুন বাংলাদেশকে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্যই তারা আরও ভুল করবেন এবং আরও বিনাশ পাওয়ার যোগ্য থাকবেন।

ভাষা আন্দোলনে শহিদের সংখ্যা দুই আঙুলেই গুনে শেষ করা যায়। নব্বইয়ের শহুরে গণ-অভ্যুত্থানের শেষ তিন মাসে নিহতের সংখ্যা ৫০ ছাড়ায় নাই। এমনকি এরশাদ পতনের আগের সপ্তাহে ডা. মিলন ও জেহাদ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আত্মদান ঘটেনি। আর জুলাই মাসের শেষ ১৪ দিন আর আগস্টের প্রথম ৫ দিনে মৃতের সংখ্যা দেড় হাজারেরও বেশি, আহত ২০ হাজারের বেশি। ভাবা যায়! ভাবা যায় কী দানবকে কী অসম্ভব সাহস আর শহিদানে রুখে দিয়েছিল আমাদের ছেলেমেয়েরা! আগের সব রাজনৈতিক দলের আন্দোলনে পুলিশের বিরুদ্ধে হাতে কাটা বন্দুক কিংবা ককটেল অন্তত তুলে নিয়েছিল প্রতিবাদকারীরা। কিন্তু এইবারে আবু সাঈদের মতো নিরস্ত্র, মুগ্ধের মতো নিরীহ, রিয়া গোপের মতো নিষ্পাপ, ওয়াসিমের মতো আবেগী, তরুয়ার মতো প্রান্তিক এবং ফারহানের মতো জানবাচ্চারা শহিদ হয়েছে। রিকশাচালক ও শ্রমজীবীদের এমন আত্মদানের মহাকাব্য যুদ্ধ পরিস্থিতি ছাড়া আর দেখা যায় না। একটা ছবিতে দেখা যায়, গলির ভেতর তিনটি কিশোর হাতে লাঠি নিয়ে সতর্কভাবে এগোচ্ছে। গলির

মাথায় পুলিশ ও ছাত্রলীগের বন্দুকধারীরা। কিন্তু ঐ তিন যোদ্ধা পিছু হটেনি। নিজের মহল্লা, নিজের গলি কিংবা নিজের ক্যাম্পাসকে তারা দানবের হাতে তুলে দেয়নি। মরেছে, তবু এক ইঞ্চি মাটি ছাড়েনি।

অশ্রু মুছে এই সব গল্প আমাদের বলে যেতে হবে। এই শ্রাবণ বিপ্লবে বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের ১৮ কোটি গল্প বলবার আছে। সেইসব গল্প অবশ্যই শুনতে হবে সরকারকে। শহিদদের কোনোভাবেই ভুলে যেতে দেওয়া যাবে না। গণভবনকে শ্রাবণ বিপ্লবের জাদুঘর করার বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত এসেছে। কিন্তু এই জাদুঘর তো নিছক স্মৃতির প্রদর্শনী হতে পারে না, ছবি বা গুলির খোসার গ্যালারি হতে পারে না। এই জাদুঘরকে হতে হবে জীবন্ত ইতিহাস, গণহত্যার অনুসন্ধানী গবেষক, শহিদদের পক্ষের সজাগ পাহারাদার, ইতিহাসের দারোয়ান।

আমরা জানতাম, সরকারকে, ছাত্র-জনতাকে, গণতন্ত্রের লড়াকু রাজনৈতিক দলগুলোকে বহুভাবে ব্যতিব্যস্ত রাখা হবে। প্রতিটি গোষ্ঠীর চারপাশে অবিশ্বাসের খাদ খোঁড়া হবে। মূল ইস্যু যে রাষ্ট্র পুনর্গঠন এবং মাফিয়াতন্ত্রের খুঁটি ওপড়ানো, তা থেকে নজর সরানোর জন্য বহু ধোঁয়াশা তৈরি করা হবে। হোক, কিন্তু যখনই পথ হারাবার ভয় আসবে, যখনই বিভেদের ফাঁদে পা আটকে যাবে, যখনই লোভের চোরাবালিতে গতি আটকে যাবে, তখনই যেন মনে পড়ে হাসপাতালে শুয়ে থাকা পা হারানো কিশোরটির কথা, চোখ হারানো ভাইটির কথা, কবরে শুয়ে থাকা বিপ্লবের বীজধানের মতো শহিদদের কথা। ভুল করার সুযোগ নাই, ভুলবার সুযোগ তো একেবারেই নিষিদ্ধ!

একাত্তরে জাতির যে সংখ্যা ছিল, আজ বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তার চেয়েও বেশি। এই তরুণেরা বেশির ভাগই উঠতি মধ্যবিত্ত ঘরের। প্রথম প্রজন্মের উচ্চশিক্ষিত এই তরুণ-তরুণীরাই ভরসা আমাদের। এই দ্বন্দ্ব উঠতি মধ্যবিত্তের সাথে বনেদি ও ফ্যাসিবাদের অবশিষ্ট স্বৈরাচারী মধ্যবিত্তের। এই দ্বন্দ্ব মুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, সকল পরিচয়ের এজমালি বাংলাদেশপন্থার সাথে লুটেরা-মাফিয়া-খুনি উপমহাদেশীয় ফ্যাসিবাদের। এই দ্বন্দ্ব পুরাতনের সাথে নতুনের। বাংলাদেশ দ্বিতীয় জন্মের আঁতুড়ঘর থেকে বেরিয়ে, গত জুলাইয়ের চাইতে এখন আরো সাবালক। বাংলাদেশের লড়াই ইনসাফের লড়াই, মর্যাদার লড়াই, জান ও জবানের স্বাধীনতার লড়াই। সার্বভৌমত্ব কথাটার ভাবসম্প্রসারণ গণতান্ত্রিক ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ছাড়া বোঝা যাবে না।

জুলাইয়ের রাষ্ট্রবাসনার সাথে তাই ফ্যাসিবাদের কিংবা তাদের সাথে মিটমাট করিয়ে নেওয়ার কোনো আপোশ হতে পারে না। আমরা যেন খ্যাপা ষাঁড়ের লাল চোখের দিকে একটানা তাকিয়ে থাকতে থাকতে পরিপার্শ্ব ভুলে না যাই। যাতে বন্ধুকে শত্রু না বানাই। একই সাথে একটা রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতা থেকে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে সেটার সুষ্ঠু মীমাংসা হওয়া দরকার। সব গণ-আন্দোলন বা গণ-অভ্যুত্থানে জয়ীরাই দেশ পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু এটা সত্য যে, জুলাইয়ের নেতৃত্ব দেশের প্রধান রাজনৈতিক পাওয়ার হাউস ছিলও না, এখনো নাই। কিন্তু যারা প্রধান, তারা যদি জুলাইয়ের সত্যিকার রাজনৈতিক ওয়ারিশান বহন না করেন, তাহলে রাজনৈতিক গতিপথে ভয়ানক সমস্যা সৃষ্টি হবে। জুলাই আরেকটা বেহাত বিপ্লব হবার আশঙ্কায় পড়বে।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ভূরাজনৈতিক ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছে। পাল্টা সুনামি তৈরির অবাস্তব কসরত যে চলবে না, তা নয়। কিন্তু রক্তের ধারা কখনো পেছনে গড়ায় না। গণতন্ত্রের পথই বাংলাদেশের পথ, সেই পথে ফাঁদ থাকলেও বাংলাদেশ এগোবে। তবে দলীয় স্বার্থ দেখতে গিয়ে যেন আমরা জাতীয় স্বার্থকে আর খাটো না করি। আর যেন ক্ষমতার 'জানালার লোভে ঘর-দরজা বিক্রি' করে না দিই। জুলাইকে বেওয়ারিশ করে দেওয়া যাবে না। সেটা হবে হাজারো শহিদের আত্মত্যাগের সাথে বেইমানি। ইতিহাস কোনো কালে কোনো বেইমানকে মাফ করে না। করেনি।

ফারুক ওয়াসিফ: লেখক ও সাংবাদিক, মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

রক্তে রাঙা জুলাই বিপ্লবঃ নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন

জাকির আবু জাফর

পৃথিবীর যে-কোনো বিপ্লব রক্তের সিঁড়ি বেয়ে আসে। আসে অসংখ্য ত্যাগ ও জীবনের বিনিময়ে। জুলাই বিপ্লবও এসেছে একই পথে। এসেছে একই রক্তে রঞ্জিত হয়ে। বিপ্লবের পথ রক্তের পথ। বিপ্লবের পথ রক্তরাঙা পথ। বিপ্লবের পথ পর্বতসম বাধার পথ। জগতে সংঘঠিত সকল বিপ্লব রক্তাক্ত। আমাদের জুলাই বিপ্লবও তেমনি মনুষ্য রক্তে সিক্ত।

একটি আন্দোলন যখন অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে, তাকে নিভিয়ে দেওয়া যায় না। বারুদ ভর্তি সময়ের উত্তাপে বিস্ফোরিত হয় সে। কোনো বাঁধ দিয়ে রোখা যায় না তাকে। ঠেকিয়ে দিতে পারে না কোনো আগ্নেয়াস্ত্রের ভাষা। সে নিজেই হয়ে ওঠে সময়ের প্রচণ্ড বিস্ফোরক আগ্নেয়গিরি। নিজেই হয়ে ওঠে এক বিস্ময় ইতিহাস। যা পাঠ করে বীরত্ববোধ করে সে জাতির পরবর্তী প্রজন্ম।

আমাদের জুলাই আন্দোলন তেমনি অপ্রতিরোধ্য একটি আন্দোলন। যা বাংলাদেশের ইতিহাসে তো বটে, গোটা পৃথিবীর ইতিহাসেও এক অনন্য নজির। এ ঘটনার সাক্ষী যারা, একদিন তারাই হবে এ জাতির সম্মানীয় মুখ। তারাই হবে জাতির বীরত্ব রচনার কারিগর।

জুলাই আন্দোলনের এমনকিছু বৈশিষ্ট্য রচিত হয়েছে, যা এর আগে কোনো আন্দোলনে দেখা যায়নি। কর্মসূচির নাম ও ধরন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এর প্রভাবও ছিল অন্যরকম। যেমন 'বাংলা ব্লকেড', 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ', 'ব্লক রেইড', 'কমপ্লিট শাট ডাউন', 'মার্চ ফর জাস্টিস', 'মার্চ টু ঢাকা'। এ রকম আকর্ষণীয় শিরোনামে চমক লাগানো কর্মসূচি ছিল এই গণ-অভ্যুত্থানে। নামে যেমন চমক ছিল, কাজেও তেমনই ছিল দুর্দান্ত গতি।

জুলাই আন্দোলন আমাদের ইতিহাসের বাঁক পরিবর্তনকারী আন্দোলন। নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনার আন্দোলন। বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ যেসব ঘটনা আপন ঐশ্বর্যে দাঁড়িয়ে গেছে তার একটি বাহান্নর ভাষা আন্দোলন। একটি উনসত্তরের গণ-আন্দোলন। একটি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এরপর নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান। সব শেষ ২৪-এর জুলাই বিপ্লব বা জুলাই আন্দোলন। একাত্তর আমাদের মহান স্বাধীনতার স্বর্ণচূড়া। চব্বিশ আমাদের সার্বভৌমত্বের রক্তাক্ত অধ্যায়।

একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক যখন পরাধীন হয়ে ওঠে, কিংবা যখন নাগরিক অধিকার লুট হয়ে যায়, তখন সত্যিকার স্বাধীনতার মর্ম অক্ষত থাকে না। অক্ষয় থাকে না স্বাধীনতার চেতনা। সেখানে জায়গা করে নেয় অপশক্তি। সেখানে জুলুম করে পেশিশক্তি। নির্যাতন-নিষ্পেষণ নিত্য যন্ত্রণার হয়ে ওঠে। সরকারবিরোধী কোনো কণ্ঠ অক্ষত ছিল না। গত সাড়ে পনেরো বছর তা-ই ঘটেছিল এই জনপদে।

এমন একটি ভয়াবহ অনিয়মের ঝড়ের কবলে পড়েছিল বাংলাদেশ। এ ঝড়ের প্রচণ্ডতা থেকে মুক্তি মিলেছে জুলাই

বিপ্লবের মাধ্যমে। তাই জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। এক নতুন যাত্রা। এক নতুন অভিযান। এর মাধ্যমে শুরু হলো রাজনৈতিক নতুন বন্দোবস্তের অভিযাত্রা।

ফলে এখন আর আগের মতো নেই বাংলাদেশ। বদলে গেছে বাংলাদেশের সামগ্রিক আয়োজন। অন্তত রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেয়েছে দেশের নাগরিকগণ। সেসব স্মৃতি এখনও ভয়ংকর অবস্থার দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষের মনে সেই দুঃসহ স্মৃতি এখনও দগদগে। এখনও সেই ভয়ংকর ক্ষত জলজ্যান্ত।

জুলাই বিপ্লব খুলে দিয়েছে আমাদের সম্ভাবনার এক নতুন দুয়ার। জাগিয়ে দিয়েছে ঘুমন্ত জনতার দেশপ্রেমের চেতনা। যে চেতনাগুলোর মুখে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে জীবন বাজি রাখতে শিখিয়েছে। যে চেতনা স্বাধীনতার স্বাদ নিতে নিজেদের বিলিয়ে দিতে প্রলুব্ধ করে। নিজ দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি প্রকাশ করে নতুন অঙ্গীকার। 'সবার উপরে দেশ' এ চেতনা এখন আমাদের তারুণ্যের রক্তের রঙে মিশে আছে। দেশপ্রেম এখন টগবগিয়ে ওঠে তারুণ্যের রক্তের শিরায়। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষত রাখতে হলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে সবাইকে, এ বোধ জাগিয়েছে জুলাই বিপ্লব। জাগিয়েছে দেশের স্বাধীনতার পক্ষে থাকার আপোশহীন মনোভাব।

স্বাধীনতার সঙ্গে সার্বভৌমত্বের বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশকে শুধু স্বাধীন হলেই চলে না। বরং স্বাধীনতার পাশাপাশি সার্বভৌমত্ব ভীষণ জরুরি। জুলাই আন্দোলনে এই বিষয়টি পরিষ্কার হলো আমাদের। এটি একটি বড়ো অর্জন জুলাই আন্দোলনের।

জুলাই বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো– একজন ড. ইউনূসকে পেয়েছে বাংলাদেশ। তিনি শান্তিতে নোবেল জয়ী। একটি জাতিকে স্বপ্ন দেখানোর এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে তাঁর। তিনি স্বপ্ন দেখান। স্বপ্নের কথা বলেন। স্বপ্নের কথা লেখেন এবং স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার পদক্ষেপ নেন। মুখে সরল হাসি টেনে জীবনের কঠিন সত্য সহজে উচ্চারণ করেন। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্বমানের একজন চিন্তক। বিশ্ব নিয়েই তাঁর ভাবনা চিন্তা সদা জাগ্রত। তিনি পৃথিবীর দরিদ্র মানুষের কথা ভাবেন, বলেন। জগতের বেকার মানুষের কথা ভাবেন। ভাবেন দুনিয়ার বুকে সুস্থ সুন্দর পরিবেশের কথা। বিশ্ব নেতাদের মধ্যে তিনি উজ্জ্বল। তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য কান পাতেন বিশ্ব নেতৃবর্গ। বিশ্বের তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও তিনি তুমুল জনপ্রিয়। তাঁর প্রতিটি কথা তারুণ্যের বুকে নতুন স্বপ্ন সৃষ্টির পক্ষে কাজ করে। নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। জাগিয়ে দেয় নতুন কর্ম চাঞ্চল্য।

এমন একজন ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। তাঁকে দেশ গঠনের কাজে পেয়েছে বাংলাদেশ। পেয়েছে জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে। বাংলাদেশ নিয়ে ড. ইউনূসের ব্যক্তিগত কিছু স্বপ্ন আছে। আছে কিছু পরিকল্পনা। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে উন্নীত করার মিশন আছে তাঁর। তিনি দেশকে অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে চান। চান বাংলাদেশের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি। চান একটি মানবিক রাষ্ট্র গঠন করতে। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে গৌরববোধ করার স্বপ্ন কার না থাকে। বোধ করি এ স্বপ্ন রয়েছে এদেশের সকল নাগরিকের। নাগরিকদের এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার পদক্ষেপ আছে তাঁর। তিনি সেই আলো ছড়িয়ে দিতে চান, যে আলোকমালায় গর্বিত হবে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক।

গোটা বিশ্বে ড. ইউনূস একটি অর্থনৈতিক মডেলে পরিণত হয়েছেন। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণের বিষয়টি বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশ তাঁর অর্থনীতির চিন্তা গ্রহণ করেছে। গ্রহণ করার পথে আরও অনেক দেশ। তাই অনেকের ধারণা আগামী শতাব্দী হবে ইউনূসের শতাব্দী।

একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এখন জুলাই বিপ্লবের পর প্রথম বড়ো ও সম্মানের অর্জনটি হয়েছে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের অধিকার। এ অর্জনটিরও বড়ো কৃতিত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের। তাঁর সৎ সাহস এবং দৃঢ়তায় স্বাধীনতা পেয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ এ বিশ্বাস প্রায়ই বিলুপ্ত ছিল। জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে তা ফিরে পেয়েছে বাংলাদেশ।

এভাবে বড়ো অর্জন এসেছে অর্থনীতিতে। বাংলাদেশের অর্থ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। ব্যাংক-বীমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো একটিও অক্ষত ছিল না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম ছিল জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে ব্যবসায়ীরা হাঁফিয়ে উঠেছিল। শেয়ার বাজার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়েছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার অল্প ক'মাসে অর্থনীতির চাকা দারুণ ভাবে সচল করেছেন। রিজার্ভ বেড়েছে। ডলারের দাম কমেছে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমেছে। সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বড়ো অংকের বৈদেশিক ঋণ শোধ করেছে। মৃতপ্রায়

ব্যাংকগুলো জীবিত করেছে। প্রবাসী রেমিট্যান্স বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতির একটি স্বস্তিদায়ক অবস্থান তৈরি হয়েছে।

রাজনৈতিক অর্জনের বিষয়টিও অতি গুরুত্বপূর্ণ। জুলাই আন্দোলনের আগে দেশে এক দলের রাজনীতিই সাঁড়াশির মতো চেপেছিল জাতির ঘাড়ে। একদলীয় জুলুম বিস্তার করেছিল কালো থাবা। সেই একদলীয় শাসনের নখরে রক্তাক্ত হয়েছিল স্বৈরাচারবিরোধী প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিটি সদস্য। গুম-খুন-নিপীড়ন নির্যাতন সীমাহীন হয়ে উঠেছিল। জুলাই আন্দোলন সফল হওয়ার মধ্য দিয়ে সেই ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। এখন যে যার কথা বলতে পারছে। যে যার দাবি-দাওয়ার বিষয় উপস্থাপন করতে দ্বিধা করছে না। কারো কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে না কেউ। যে যার কথা বলছে দ্বিধাহীন, বাধাহীন। এখন রাজনৈতিক হানাহানিতে রাষ্ট্রীয় কোনো বাহিনী জড়িত নয়। কোনো গোয়েন্দা সংস্থা পুলিশ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং কোনো গোয়েন্দা সংস্থা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে না। বরং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দায়িত্বশীল কর্মে নিয়োজিত রয়েছে।

পুলিশ বাহিনী যেভাবে সরকার দলীয় ক্যাডারে পরিণত হয়েছিল। সেবকের জায়গায় পুলিশের ব্যবহার ছিল সরকারি দলীয় ক্যাডার বাহিনীর মতো। অপরাধীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার কথা পুলিশের। সেখানে অপরাধীর আশ্রয়দাতা হয়ে উঠেছিল পুলিশ বাহিনী। জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটেছে তেমন পরিস্থিতির। ড. ইউনূস সরকার মোটা দাগে পুলিশের মধ্যে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে।

স্বৈরাচারী সরকারের সময়ে আমাদের উচ্চ শিক্ষার স্থান অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে উঠেছিল শিক্ষার্থী নির্যাতনের কেন্দ্র। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছে। হাত-পা-চোখ হারিয়ে বরণ করেছে পঙ্গুত্ব অন্ধত্ব। সেই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেয়েছে দেশ।

জুলাই আন্দোলনের আরেকটি বড়ো অর্জন সংস্কার আয়োজন। নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে পুলিশী ব্যবস্থা পর্যন্ত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখন দেশ গঠন করার সময়। এখন স্বপ্ন রূপায়ণের সময়। এখন স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার সময়।

এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে, যা হবে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্র হবে নাগরিকবান্ধব রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্র হবে তার নাগরিকের জন্য নিরাপদ। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিনীতিও হবে এ দেশের মাটি ও মানুষের স্বপ্নের আলোকে।

বাংলাদেশের প্রতিটি বাঁকে নতুন জীবনের রং মেখে দিতে হবে। নতুন জীবনের গান গাইতে হবে। নতুন আনন্দের আয়োজন করতে হবে। অবশ্য সেই সাথে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। নিজেদের বেড়ে উঠতে হবে যোগ্য নাগরিক হিসেবে। সামগ্রিক আয়োজনে গড়তে হবে একটি নতুন বাংলাদেশ। যে দেশে থাকবে না রাজনৈতিক হানাহানি। থাকবে না হিংসাবিদ্বেষ। থাকবে না লুটপাট ও ক্ষমতা দখলের ভয়াবহতা।

বরং যে যার যোগ্যতা অনুযায়ী বুঝে পাবে তার অধিকার। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে এলো। বিপ্লবের এ বর্ষপূর্তিতে কদিন আগে লিখেছি একটি কবিতা। 'একটি জুলাই এসেছিল বাংলাদেশে' শীর্ষক আমার সেই কবিতাটি দিয়েই শেষ করি লেখাটি–

সামনে বাড়ো, বলল নতুন স্বপ্ন এসে
একটি জুলাই এসেছিল বাংলাদেশে।
সেই জুলাইয়ে তোমরা যারা বিপ্লবী বীর
যেমন ছিল গর্জে ওঠা বীর তিতুমীর।
সেই জুলাইয়ের গল্প-গাথা শুনতে কি চাও
বাংলাদেশের হৃদয় থেকে হাত পেতে নাও।
দেশের বুকে বুক লাগিয়ে বুঝতে পারো
স্বপ্ন তোমার দীর্ঘ করো, আরো আরো।
আবু সাঈদ, নামটি মনে পড়ছে নাকি
বুকের ভেতর বুলেট নিলো, জানো তা কি!
মুগ্ধ যখন 'লাগবে পানি' বলল হেসে
সেই হাসিটা ছড়িয়ে গেল বাংলাদেশে।
বিপ্লবীদের রক্তে থাকে বারুদ শিখা
সেই শিখাতে স্বাধীনতার নামটি লিখা।
তোমরা যারা স্বাধীন থাকার ইচ্ছে রাখো
মুক্ত মনে দুঃসাহসের গন্ধ মাখো।
সেই জুলাইয়ে শহিদ যারা, তাদের জানো
একটুও কাজ করবে না কেউ লোক দেখানো।
লোকের কথায় কি আসে যায়, বুঝবে এটি
সকল কাজে গ্রহণ করো সত্য যেটি।
সত্য ছাড়া নেই জীবনের মুক্তি কোনো
আলোর পথে নতুন দিনের স্বপ্ন বোনো।
নিজকে নিজে স্বচ্ছ রাখো নিজের কাছে
দেখবে তখন তোমার কেমন শক্তি আছে!
ন্যায়ের পথে তুমিও এক বিপ্লবী হও
অসহায়ের পক্ষে তুমি হক কথা কও।
দুঃখীজনের জন্যে বিছাও মায়াবী জাল
তোমার জন্য অপেক্ষমাণ এই মহাকাল।
বিপ্লবীদের গল্পগুলো বলবে হেসে
একটি জুলাই এসেছিল বাংলাদেশে।

জাকির আবু জাফর: সাহিত্যিক, গীতিকার ও সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক নয়াদিগন্ত, zabuzafar@gmail.com

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ মাহফুজ আলম ৭ই জুলাই ২০২৫ ঢাকায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্র 'শ্রাবণ বিদ্রোহ'-এর প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

জুলাইয়ের স্মৃতি ধারণে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রয়াস

মো. মামুন অর রশিদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই গণ-অভ্যুত্থান শুধু ঘটনার ধারাবাহিকতা নয়; এটি আমাদের চেতনার উৎস। গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি চিত্র এবং প্রতিটি প্রতিবাদ আমাদের ইতিহাসের একেকটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু স্মরণ করলেই এই ইতিহাসের দায় শেষ হয় না– তাকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ছড়িয়ে দিতে হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণ ও প্রচার কেবল একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় নয়; এটি দায়িত্ব, এটি চেতনার উত্তরাধিকার। দায়িত্ব ও চেতনাবোধের জায়গা থেকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণ ও প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ জনস্মৃতিতে জীবন্ত করে রাখতে তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহের নির্বাচিত আলোকচিত্র নিয়ে পিআইডি ইতোমধ্যে 'রক্তস্নাত জুলাই বিপ্লব' শিরোনামে ফটো অ্যালবাম প্রকাশ করেছে। এই অ্যালবামে ২০২৪ সালের ৫ই জুন থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত আন্দোলনকেন্দ্রিক বিভিন্ন ঘটনার স্থিরচিত্র স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি পিআইডি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে 'রক্তস্নাত জুলাই বিপ্লব' শিরোনামে ১০ খণ্ডের সংকলন প্রকাশ করেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ভিডিও সংগ্রহেরও উদ্যোগ নিয়েছে পিআইডি। ইতোমধ্যে এক হাজারের অধিক ভিডিও সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব ভিডিও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য শীঘ্রই বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে প্রেরণ করা হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহের তথ্য সংরক্ষণ ও জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে পিআইডি একটি নতুন ওয়েবসাইট চালু করেছে। এ বছরের ২৫শে মার্চ তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ মাহফুজ আলম এই ওয়েবসাইটের (inauguration.julyuprising.com) উদ্বোধন করেন। এই ওয়েবসাইটে চারটি ক্যাটাগরিতে গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করা হয়েছে। 'স্ক্যান নিউজপেপার' ক্যাটাগরিতে গণ-অভ্যুত্থানকালীন পত্রিকাসমূহের সম্পূর্ণ স্ক্যান কপি আপলোড করা হয়েছে। 'নিউজ ক্লিপিং' ক্যাটাগরিতে রয়েছে গণ-অভ্যুত্থান চলাকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ক্লিপিং। 'ফটো অ্যালবাম' ক্যাটাগরিতে পত্রিকায় প্রকাশিত এবং বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত আন্দোলন-সংক্রান্ত স্থিরচিত্র আপলোড রয়েছে। এছাড়া 'রিজিওনাল নিউজপেপার' ক্যাটাগরিতে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের পত্রিকার সম্পূর্ণ স্ক্যান কপি আপলোড করা হয়েছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে প্রকাশনা তৈরি এবং প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। ডিএফপি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর ইতোমধ্যে ৯টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে চার বিভাগের (চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর ও খুলনা) আন্দোলনকেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর পৃথক চারটি প্রামাণ্যচিত্র। বাকি পাঁচটি প্রামাণ্যচিত্র হলো: 'শ্রাবণ বিদ্রোহ', 'আঁধার পেরিয়ে', 'একটি স্বপ্নের জন্য', 'গণমুক্তি অনিবার্য' এবং 'লেখা আছে অশ্রু জলে'। প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের পাশাপাশি ডিএফপি বেশকিছু প্রকাশনা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের ওপর অঙ্কিত গ্রাফিতি-বিষয়ক সচিত্র অ্যালবাম '৩৬ জুলাই: গ্রাফিতিতে বাংলাদেশ'-এর ১ম ও ২য় খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, ডিএফপি গণ-অভ্যুত্থানের ওপর নিয়মিত প্রকাশনা 'সচিত্র বাংলাদেশ', 'নবারুণ' ও 'বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি'-এর কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক তথ্য প্রচারে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিটিভিতে প্রচারিত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে, 'ফ্যাসিবাদের দিনলিপি', 'আগামীর বাংলাদেশ', 'নিপীড়নের স্মৃতি', 'এই ত্যাগ রবে অম্লান', 'রক্তে ভেজা বাংলাদেশ', 'অদম্য তারুণ্য', 'দিয়েছে যে প্রাণ' প্রভৃতি। এছাড়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের নিয়ে বিটিভি নিউজ-এ ৫০ পর্বের প্রামাণ্যচিত্র প্রচার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিটিভিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর নির্মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রামাণ্যচিত্র ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হচ্ছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে বাংলাদেশ বেতারও বহুমুখী অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে বেতারে নিয়মিত কথিকা, আলোচনা, আহত ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার ও ফোন-ইন অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ বেতারে রাষ্ট্র সংস্কার, তারুণ্যের শক্তি ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, আলোচনা, উদ্দীপনামূলক গান ও নাটিকা প্রচারিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ এবং অভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। 'গণ-অভ্যুত্থানের গাথা– বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আত্মদানের গল্প' শিরোনামে এসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাসস এ-সংক্রান্ত ৮৫৯টি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহের তথ্য নিয়ে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রতিষ্ঠা করেছে 'জুলাই আর্কাইভ'। এই আর্কাইভে রয়েছে জাতীয় ও আঞ্চলিক মিলিয়ে ২৪টি পত্রিকার ডিজিটাইজড কপি, বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত ১০ হাজারের বেশি গ্রাফিতির ফটো অ্যালবাম, আন্দোলনের আলোকচিত্র, গান ও কবিতার অ্যালবাম। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর কয়েকটি প্রকাশনাও বের করেছে পিআইবি। এছাড়া, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদ ছয় সাংবাদিকের স্মৃতিকে স্মরণীয় করতে পিআইবিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'শহিদ স্মৃতি কর্নার'। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে পিআইবি বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহের তথ্য মাঠ পর্যায়ে প্রচারের ক্ষেত্রে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের অধীন জেলা তথ্য অফিসসমূহ জনবহুল স্থানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর নির্মিত বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করছে। এছাড়া, উঠান বৈঠক, নারী সমাবেশ, আলোচনাসভাসহ অন্যান্য প্রচারকৌশলের মাধ্যমেও

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা ৭ই জুলাই ২০২৫ ঢাকায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্র 'শ্রাবণ বিদ্রোহ'-এর প্রিমিয়ার শো'তে সভাপতির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

জেলা তথ্য অফিসসমূহ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করছে। এর পাশাপাশি আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে তারুণ্যের ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে জেলা তথ্য অফিসসমূহ কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে 'আমার কিছু বলার আছে'– শীর্ষক মতবিনিময় সভা আয়োজন করছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অডিও-ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ। 'দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪-এর অডিও-ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ'– শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহের ভিডিও সংগ্রহের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করেছে। এই প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল ২০২৫ থেকে জুন, ২০২৭ পর্যন্ত। গণ-অভ্যুত্থানের ভিডিওসমূহ সংগ্রহ শেষে তা স্থায়ীভাবে ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হবে।

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ মাহফুজ আলম ১৩ই জুলাই ২০২৫ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহের ওপর নির্মিত ১০টি পোস্টার ও Notes on July পোস্টকার্ড প্রকাশ' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের অংশ হিসেবে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে নিয়ে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট তিনটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছে। এগুলো হলো– 'ছাদ আকাশের গল্প', 'পথ' ও 'জুলাইয়ের চিঠি'। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটও জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে ছয়টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছে। এগুলো হলো– 'সময়ের বীর শহিদ তানভীর', 'জুলাই বিপ্লব : রক্তে লেখা নতুন ভোর', 'বিপ্লব সারথী শহিদ আহসান হাবীব', 'গণজাগরণ '২৪ : পঞ্চগড়ের শাওন', 'Crimson Sorrow' ও 'শহিদ শাহারিয়ার খান আনাস'। এছাড়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে সরকারি অনুদানে দুটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং আটটি শর্টফিল্ম ও স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হবে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মরণে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা, পত্রিকায় বিশেষ ফিচার, নিবন্ধ ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ, দেশব্যাপী বিলবোর্ড স্থাপন, পোস্টার ও ফেস্টুন মুদ্রণ ও বিতরণ। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হবে। তথ্য ভবনে এই প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর রচিত গ্রন্থসমূহ এই উৎসবে প্রদর্শিত হবে। গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করবে। এছাড়া, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অভ্যুত্থানে শহিদ সাংবাদিক পরিবারকে সম্মাননা, বিশেষ অনুদান ও উপহার প্রদান করা হবে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক দীপ্তিময় অধ্যায়। এই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বন্দি রাখার বিষয় নয়–এটি আমাদের আত্মপরিচয়ের অংশ। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণ ও প্রচারে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব শুধু প্রশাসনিক নয়, এটি জাতীয় কর্তব্যও বটে। আর্কাইভিং, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও প্রকাশনার মাধ্যমে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস কেবল সংরক্ষিতই থাকবে না, তা হয়ে উঠবে গবেষণার অন্যতম উপকরণ। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক তথ্য প্রচারে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বহুমুখী উদ্যোগ অভ্যুত্থানের চেতনাকে জনস্মৃতিতে ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মো. মামুন অর রশিদ: জনসংযোগ কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, mmrashiddu1990@gmail.com

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ২রা জুন ২০২৫ ঢাকায় তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন— পিআইডি

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট

এম এ খালেক

ব্যাপক পরিবর্তন-পরিমার্জন ছাড়াই ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদিত হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কেমন বাজেট প্রণয়ন করে তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে নানামুখী আলোচনা চলছিল অনেক দিন ধরেই। প্রণীত বাজেট গণপ্রত্যাশা পূরণে কতটা সক্ষম হবে তা নিয়ে এখন চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট অনেকটাই গতানুগতিক এবং পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রণীত হয়েছে। অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো এড়িয়ে যাননি। তিনি বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন অকপটে। অতীতে দেখা গেছে, প্রতিবছরই বাজেট ঘোষণার সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের যেসব ইতিবাচক তথ্য প্রকাশ করা হতো তার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল থাকত না। গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্টের (জিডিপি) আকার বাড়িয়ে দেখানো হতো। বিশ্বব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড (আইএমএফ) জিডিপি'র আকার ও প্রবৃদ্ধির হার সংক্রান্ত যে তথ্য প্রদান করত তার সঙ্গে সরকারের দেওয়া তথ্যের অন্তত ১ থেকে দেড় শতাংশ গড়মিল থাকত। বছরান্তে কোনো পক্ষই তাদের অবস্থান থেকে সরে আসত না। মূল্যস্ফীতি এবং বেকারত্বের হার কমিয়ে দেখানো হতো। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেটে পরিসংখ্যানের অতিরঞ্জন এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে। আর বাজেট অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যা এই মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন ছিল।

গত ২রা জুন ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ কার্যকর না থাকায় টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রস্তাবিত বাজেট জনসম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। এটা ছিল বাংলাদেশের ৫৪তম পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বাজেট। ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে প্রথম পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বাজেট পেশ করা হয়েছিল, যাতে আয় এবং ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল যথাক্রমে ২৮৫ দশমিক ৩৮ কোটি টাকা ও ২১৮ দশমিক ৪৩ কোটি টাকা। বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে এটাই প্রথম জাতীয় বাজেট। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিপর্যস্ত-প্রায় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং নিম্ন প্রবৃদ্ধির কালে জাতীয় বাজেট কেমন হবে তা নিয়ে অর্থনীতিবিদ এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ লক্ষ করা যাচ্ছিল। প্রস্তাবিত বাজেটে সেই উদ্বেগ কিছুটা হলেও দূর হয়েছে। জনতুষ্টিমূলক বাজেটের পরিবর্তে কীভাবে জনকল্যাণমূলক বাজেট প্রণয়ন করা যায় সেই প্রচেষ্টা প্রস্তাবিত বাজেটে লক্ষ করা গেছে। এরপরও গণ-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয়েছে, তা বলা যাবে না। বাজেট-উত্তর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রস্তাবিত বাজেট কিছুটা হলেও গতানুগতিক হয়েছে। অনেকেই বলছেন, আমরা আগের সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। এই অভিযোগ পুরোপুরি ঠিক নয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে চট করেই বিপ্লবী বাজেট দিয়ে দেব, দারুণ রাজস্ব আয় করে ফেলব, তা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, প্রতিবছরই আগের বছরের তুলনায় বড়ো বাজেট দেওয়া হয়। কিন্তু আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট কিছুটা হলেও চলতি অর্থবছরের বাজেটের চেয়ে কিছুটা ছোটো হয়েছে। ফলে বাজেট বাস্তবায়ন অধিকতর সহজ হবে। অর্থ উপদেষ্টা তার বক্তব্যে দেশের অর্থনীতির বাস্তবতা তুলে ধরে বলেন, অর্থনীতির বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। তাই বাজেট প্রণয়নকালে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা সব সময়ই বিশেষ চ্যালেঞ্জিং। অর্থ আয় বা সংগ্রহ এবং অর্থ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা খুবই কঠিন কাজ। সাধারণত তিন ধরনের বাজেট প্রত্যক্ষ করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে পারিবারিক বাজেট, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের বাজেট এবং রাষ্ট্রীয় বাজেট। প্রতি ক্ষেত্রেই বাজেটের উদ্দেশ্য থাকে একটি নির্দিষ্ট বছরের আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্য খতিয়ান প্রণয়ন করা। কীভাবে অর্থ উপার্জন করা হবে এবং কোন কোন খাতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে তা বাজেটের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্রীয় বাজেটে ব্যয়ের খাত বিবেচনায় আয়ের উৎস এবং পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্র চাইলেই তার আয় বাড়াতে পারে। যদিও এতে জনগণের ওপর চাপ বাড়ে, ভোগান্তি সৃষ্টি হতে পারে। বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করেও রাষ্ট্র তার ব্যয়ের চাহিদা মেটাতে পারে। তবে জনদুর্ভোগের বিষয়টি বিবেচনায় রাষ্ট্র সব সময়ই চেষ্টা করে কীভাবে জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টি না করেও তার আর্থিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। আর বিদেশ থেকে ঢালাওভাবে ঋণ গ্রহণ করলে একটি দেশ ঋণগ্রস্ত দেশে পরিণত হতে পারে। তাই বিদেশি ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদেরও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। রাজনৈতিক সরকার দায়িত্বে থাকলে স্থানীয় নেতাদের চাহিদা মতো অনেক সময় তুলনামূলক কম প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পেও অর্থ বরাদ্দ করতে হয়। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সে রকম কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না বলে তারা চেষ্টা করলে জাতির জন্য সর্বোত্তম কল্যাণকর খাতে অর্থ বরাদ্দ করতে পারে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম বাজেটে আমরা কিছু বিষয় প্রত্যক্ষ করছি যা ইতিবাচক। অপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থ ব্যয় কমানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। আগের যে-কোনো বছরের তুলনায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেট অনেকটাই বাস্তবসম্মত।

২রা জুন ২০২৫ অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপনের জন্য ঢাকায় বিটিভি ভবনে– পিআইডি

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেটের আকার ধরা হয়েছে ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। গত অর্থবছরের (২০২৪-২০২৫) বাজেটের আকার ছিল ৭ লাখ ৯৮ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে বাজেটের আকার কমেছে ৮ হাজার কোটি টাকা। নতুন বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা, যা আগের বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির চেয়ে ৩৫ হাজার কোটি টাকা কম। নতুন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিদেশি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ১৫ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে ৮৫ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাজেটে মেগা প্রকল্পে নতুন করে কোনো ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। নতুন বাজেটে বছর শেষে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ৬ দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের নীচে রাখা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকা। চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। পরে তা সংশোধন করে ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে কৃষি খাতে ভর্তুকি বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৭ হাজার কোটি টাকা।

স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের ১৫ শতাংশ বা জিডিপি'র ৫ শতাংশ বরাদ্দের সুপারিশ করলেও এ খাতে নতুন বাজেটে ৪১ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা, যা বাজেটের ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। টাকার অঙ্কে স্বাস্থ্য খাতে চলতি অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় বরাদ্দ ৫০০ কোটি টাকা বাড়লেও জিডিপি'র আয়তনের অনুপাতে তা কমেছে। গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল তা ছিল জিডিপি'র শূন্য দশমিক ৭৪ শতাংশ। এবারের বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে জিডিপি'র শূন্য দশমিক ৬৭ শতাংশ। শিক্ষা খাতে বারদ্দ দেওয়া হয়েছে ৯৫ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ। গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে শিক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দ ছিল ৯৪ হাজার ৭১১ কোটি টাকা,যা জিডিপি'র শূন্য দশমিক ৬৭ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৫৭ হাজার ৪৫৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র শূন্য দশমিক ৯২ শতাংশ। এই বরাদ্দের পরিমাণ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় এক চতুর্থাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে গড় বরাদ্দের পরিমাণ জিডিপি'র ৩ দশমিক ৮ শতাংশ।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রণীত হয়েছে, তার প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিরাজমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার প্রসঙ্গটি। অর্থবছর শেষে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ৬ দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। গত তিন অর্থবছরেরও বেশি সময় ধরে দেশের অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার এই সময় প্রায়শই সাড়ে ৯ শতাংশের উপরে ছিল।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের পুরোটা জুড়েই উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজমান ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি ছিল ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশ। গতবছর জুলাই মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। সেই সময় খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১৪ দশমিক ১০ শতাংশ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ৯ মাসে মূল্যস্ফীতি সামান্য কমে এপ্রিল মাসে ছিল ৯ দশমিক ১৭ শতাংশ। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে মূল্যস্ফীতির হার কমিয়ে সাড়ে ৬ শতাংশে নিয়ে আসা খুব চ্যালেঞ্জিং হবে? আইএমএফ তাদের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার ১০ শতাংশের আশপাশে থাকতে পারে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি সবচেয়ে বেশি। বাজেট বা মুদ্রানীতি দিয়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমানো যাবে না। এর জন্য বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে। তবে আশার কথা এই যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে কমে আসতে শুরু করেছে।

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ২রা জুন ২০২৫ ঢাকায় রামপুরায় বিটিভি ভবনে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করেন— পিআইডি

বর্তমানে আমরা দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি প্রত্যক্ষ করছি তা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। উল্লেখ্য, করোনা-উত্তর বিশ্ব অর্থনীতি যখন উত্তরণের পর্যায়ে ছিল ঠিক তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের কারণে পুরো বিশ্বব্যাপী পণ্য সাপ্লাই চেইন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার (সিডিউল ব্যাংকগুলো গ্রাহক পর্যায়ে ঋণদানের সময় যে সুদ চার্জ করে) ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা কমে যায়। বাজারে অর্থের জোগান হ্রাস পায়। এছাড়া আরো কিছু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতির হার সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসে। কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্তত ৭৭টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পলিসি রেট বৃদ্ধি করে। অধিকাংশ দেশই তাদের অর্থনীতিতে বিরাজমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি শ্রীলংকার মতো দেশও তাদের মূল্যস্ফীতি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব আমেরিকার অনুসরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বার বার পলিসি রেট বাড়িয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর দায়িত্ব গ্রহণের পর ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চ সীমা তুলে দিয়েছেন। ফলে ব্যাংক ঋণের সুদের হার এখন ১৪/১৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার প্রবণতা কমেছে। বাজারে অর্থের জোগান হ্রাস পেয়েছে। মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে কমে আসার এটাই প্রধান কারণ। বাংলাদেশ ব্যাংক যদি পলিসি রেট বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংক ঋণের সুদের হার বাজারভিত্তিক করত তাহলে মূল্যস্ফীতি এতটা উচ্চ এবং দীর্ঘস্থায়ী হত না।

কিছুদিন আগে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার পুরোপুরি বাজারভিত্তিক করা হয়। কিন্তু এরপর বাজারে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। মার্কিন ডলারের বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করার ফলে রেমিট্যান্স আয় বাড়ছে উল্লেখযোগ্যভাবে। অর্থবছরের অনেকটা জুড়ে দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করা সত্ত্বেও প্রথম ১০মাসে (জুলাই-এপ্রিল) ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। অতীতে আর কখনোই পুরো অর্থবছরেও এত বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স আহরিত হয়নি। এক মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ৩২৯ কোটি মার্কিন ডলার। মার্কিন ডলারের বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ বাড়াতে শুরু করেছে।

নতুন বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকা। গত অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। পরে তা সংশোধন করে ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগের অর্থবছরের বাজেটে পরোক্ষ করের হার ছিল ৬৩ দশমিক ৪ শতাংশ। পরোক্ষ করের হার কমিয়ে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়ানো প্রয়োজন।

দেশের পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে নতুন কোম্পানি তালিকাভুক্তিকরণের জন্য কর হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। নতুন কোম্পানি তালিকাভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কর হারের ব্যবধান বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে লিস্টেড এবং নন-লিস্টেড কোম্পানির কর হারের ব্যবধান হচ্ছে ৫ শতাংশ। আগামী বছর

তা সাড়ে ৭ শতাংশ হবে। বর্তমানে বিদ্যমান কর হার মোতাবেক পুঁজি বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে ২০ শতাংশ হারে করপোরেট ট্যাক্স প্রদান করতে হয়। তবে এই কর ছাড় সুবিধা পাবার জন্য বেশ কিছু কঠিন শর্ত পালন করতে হয়, যা অধিকাংশ কোম্পানির পক্ষেই সম্ভব হয় না। ফলে তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে ২২ দশমিক ৫ শতাংশ হারে করপোরেট ট্যাক্স প্রদান করতে হচ্ছে। নন-লিস্টেড কোম্পানির করপোরেট ট্যাক্স ২৫ শতাংশ হলেও শর্ত পালনে ব্যর্থতার জন্য অধিকাংশ কোম্পানিকে ২৭ দশমিক ৫০ শতাংশ হারে করপোরেট ট্যাক্স প্রদান করতে হয়। নতুন অর্থবছরের বাজেটে নন-লিস্টেড কোম্পানির করপোরেট ট্যাক্স হার ২৭ দশমিক ৫০ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। আর লিস্টেড কোম্পানির করপোরেট ট্যাক্স ২০ শতাংশই রাখা হয়েছে। তালিকাভুক্ত কোম্পানির মালিকগণকে যাতে ২০ শতাংশের বেশি করপোরেট ট্যাক্স প্রদান করতে না হয় সে জন্য আরোপিত শর্তে কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে। এতদিন তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে ২০ শতাংশ করপোরেট ট্যাক্স সুবিধা পাবার জন্য তাদের সমুদয় আয়-ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে করতে হত। এই শর্ত পরিপালন করা অনেক কোম্পানির পক্ষেই সম্ভব হচ্ছিল না। বাজেটে শুধু কোম্পানির আয় ব্যাংকিং চ্যানেলে করার শর্ত থাকবে। অন্য আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলে করার শর্ত পরিহার করা হয়েছে। এই উদ্যোগ স্বল্প মেয়াদে পুঁজিবাজার উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

বাজেটে প্রসঙ্গ এলেই দেশের অর্থনৈতিক চিত্র সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বিগত সরকারের শাসনামলে দেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার জের এখনো আমরা বয়ে চলেছি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বা যে পদ্ধতির সরকারই দায়িত্ব পালন করুক না কেনো রাতারাতি অর্থনীতিকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। দেশে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৫ দশমিক ৫০ লাখ। গত ডিসেম্বরে তা ২৭ লাখে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ বেকারের হার বেড়েছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ।

জুলাই-এপ্রিল, ২০২৩-২০২৪-এর রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৬৬১ কোটি মার্কিন ডলার, যা জুলাই-এপ্রিল, ২০২৪-২০২৫-এর এসে ৪ হাজার ২১ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ। একই সময়ে প্রবাসী আয় ১ হাজার ৯১২ কোটি মার্কিন ডলার থেকে ২হাজার ৪৫৪ কোটি মার্কিন ডলারের উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ২৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ। গত জুলাই-এপ্রিল সময়ে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩ লাখ ৫৮ হাজার কোটি টাকার স্থলে আদায় হয়েছে ২ লাখ ৮৯ কোটি টাকা। প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট-জিডিপি রেশিও ছিল ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৪ দশমিক ১৮ শতাংশ, যা বর্তমানে ২২ দশমিক ৪৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এটা বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যকর উদ্যোগের ফলে বিদেশি বিনিয়োগ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি রাজধানীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন বেশ সাড়া জাগিয়েছে। চীনা বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ১২৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় চীনা বিনিয়োগকারীরা তাদের শিল্পকারখানা আশপাশের দেশে স্থানান্তরের চিন্তাভাবনা করছেন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হতে পারে প্রধান গন্তব্য। দেশে কার্যকর বিনিয়োগ পরিবেশ গড়ে তোলা না গেলে স্থানীয় বা বিদেশি কোনো বিনিয়োগই প্রত্যাশিত মাত্রায় আহরণ করা সম্ভব নয়। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নানামুখী সমস্যার মধ্যে বাজেট প্রণয়ন করতে হয়েছে। কাজেই রাতারাতি বিপ্লবী বাজেট প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। বাজেট যেভাবেই প্রণীত হোক না কেন মূল বিষয় হচ্ছে বাজেট ঠিক মতো বাস্তবায়ন করা। অর্থ উপদেষ্টা বাজেট-উত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থনীতির বাস্তবচিত্র তুলে ধরেন। তিনি কোনো তথ্য অতিরঞ্জিত করে দেখানোর চেষ্টা করেননি এবং কোনো তথ্য লুকানোর চেষ্টাও করেননি। সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টায় বাজেট সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের পথে ধাবিত হোক– এই প্রত্যাশা সকলেরই।

এম এ খালেক: অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ও অর্থনীতি বিষয়ক লেখক,
khaleque09@yahoo.com

কমনওয়েলথ চার্টার কর্মশালার উদ্বোধন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ২৩শে জুন গুলশানের লেকসোর হাইটস হোটেলের সম্মেলনকক্ষে কমনওয়েলথ চার্টার কর্মশালার উদ্বোধন করেন। কমনওয়েলথ এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে প্রায় ১০০ জন যুব ও যুব নারী প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এসময় উপদেষ্টা বলেন, কমনওয়েলথ সনদ গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং অন্যান্য মূল্যবোধের প্রতি সম্মিলিত বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। এটি ৫৬টি দেশের ২.৫ বিলিয়নের বেশি মানুষের জন্য নৈতিক দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। ২০১৩ সালে গৃহীত হওয়ার পর থেকে সনদটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে শান্তি ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে সমাজকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে।

তিনি বলেন, কমনওয়েলথ সনদে অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ যেমন: গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন এবং আইনের শাসন সম্পর্কে শেখার মাধ্যমে আমাদের যুবসমাজ চলমান জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। উপদেষ্টা সকলকে আলোচনায় সক্রিয়ভাবে জড়িত হতে, ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে এবং আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথকে রূপ দিতে পারে এমন ব্যবহারিক সুপারিশগুলো প্রস্তাব করতে উৎসাহ প্রদান করেন।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

অধ্যাপক ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

আটাশ বছর ধরে বহুবার সুন্দরবন গিয়েছি। হাড়বাড়িয়া, হরিণটানা, আন্দারমানিক, সুপতি, কচিখালী, ডিমের চর, কটকা, কোকিলমনি, শেখেরটেক, মুন্সীগঞ্জ, কদমতলা, কলাগাছিয়া, দোবেকি, বুড়ি গোয়ালিনী– কোনোটাই বাদ পড়েনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বার বার সুন্দরবনে গিয়েও সুন্দরবনের রাজা 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বা 'বাংলা বাঘ'-এর দেখা পাইনি। অবশ্য বেশ ক'বার দেখা হতে হতেও রাজার সঙ্গে দেখা হয়নি।

বাংলাদেশের জাতীয় প্রাণী সুন্দরবনের এই বাঘকে ঘিরে রয়েছে নানা গল্প, কিংবদন্তি বা মিথ (Myth)। বনের বাওয়ালি (কাঠুরে), মৌয়াল (মধু সংগ্রহকারী), জোংড়াখুটা (শামুক-ঝিনুক ও চিংড়ি সংগ্রহকারী), জেলে ও আশপাশের এলাকার লোকদের ধারণা বাঘের নাম মুখে নিলে তাকে অপমান করা হয়; এতে তাদের অমঙ্গল হবে। তাই বিভিন্ন বিশ্বাস মতে বাঘের বিভিন্ন নামের প্রচলন হয়েছে, যেমন– বড়ো মামা, বড়ো শিয়াল, বনরাজা, বড়োকর্তা, বড়ো সাহেব, গাজী ঠাকুর, বড়ো পাইক ইত্যাদি।

আমাদের বাংলা বাঘ বিশ্বব্যাপী Tiger, Bengal Tiger, Royal Bengal Tiger বা Indian Tiger নামে পরিচিত। বিড়াল গোত্র Felidae (ফ্যালিডি)-এর সদস্য বাঘের বিজ্ঞানভিত্তিক নাম Panthera tigris (প্যানথেরা টাইগ্রিস)। যদিও পৃথিবীতে বাঘের কয়টি উপপ্রজাতি রয়েছে– এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈততা রয়েছে, যেমন– এক সময় বলা হতো আটটি এবং পরবর্তীতে বলা হয়েছে দুটি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাঘ বিশেষজ্ঞরা নতুন করে বলছেন নয়টি উপপ্রজাতির কথা। জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil) রেকর্ড অনুযায়ী সাইবেরিয়ার বাঘ থেকে অন্যান্য উপপ্রজাতি বিবর্তিত হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই নয়টি উপপ্রজাতির মধ্যে ক্যাস্পিয়ান, বালি ও জাভা উপপ্রজাতির বাঘ চিরতরে দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাকি ছয়টির মধ্যে সাইবেরিয়ান, ইন্দো-চাইনিজ, মালয়ান, ম্যান্ডারিন এবং সুমাত্রা উপপ্রজাতিও হারিয়ে যাওয়ার পথে। এর মধ্যে সাইবেরিয়ান উপপ্রজাতির অবস্থা সব থেকে করুণ। বর্তমানে শুধু

বেঙ্গল টাইগার উপপ্রজাতিটিই (Panthera tigris) পৃথিবীতে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে সেও আজ হুমকির মুখোমুখি।

যাহোক, জীবনে প্রথমবার সুন্দরবন যাই ১৯৯৭ সালে আমার এক আত্মীয়ের আমন্ত্রণে। উনি তখন সুন্দরবনের বুড়ি গোয়ালিনী রেঞ্জের অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ ফরেস্ট অফিসে ফরেস্টার হিসেবে কর্মরত। মুন্সীগঞ্জ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার একটি ইউনিয়ন। খুলনা, মংলা, বাগেরহাট, কুয়াকাটা যেদিক দিয়েই সুন্দরবন যাওয়া যাক না কেন একমাত্র মুন্সীগঞ্জ থেকেই সরাসরি সুন্দরবনের সবুজ বন দেখা যায়। মুন্সীগঞ্জ ফরেস্ট অফিসের উল্টো পাশেই সুন্দরবন। মাঝে বয়ে চলেছে চুনা নদী। এই নদী পার হয়ে ওপারে গেলেই পুরানো বন অফিস। খুলনা শহর থেকে রওয়ানা হয়ে সাতক্ষীরা হয়ে শ্যামনগরের মুন্সীগঞ্জ পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। পরদিন সকালে ক্যামেরা হাতে আশপাশটা ঘুরলাম। বিকেলে স্থানীয় এক বৃদ্ধ কৃষকের সঙ্গে আলাপ হলো। উনার কাছেই শুনলাম তার বাঘ দেখার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা। শিহরিত হয়েছিলাম তার গল্প শুনে। কীভাবে উনি একদিন একরাত বাঘের ভয়ে একটি স্কুল ঘরের চালের নীচে লুকিয়েছিলেন সেই গল্প।

দ্বিতীয়দিন রাত প্রায় আটটার দিকে মুন্সীগঞ্জ ফরেস্ট অফিসের জেটির কাছে এক আত্মীয়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম। কিছুক্ষণ পর একজন বনরক্ষী এসে বললেন, 'আপনারা এখানে এসময় কী করছেন?' আমরা বললাম, 'গল্প করছি, কেন? কী হয়েছে?' উনি বললেন, 'এসময় এই জায়গাটা মোটেও নিরাপদ নয়। যে-কোনো সময় বাঘ এসে হাজির হতে পারে।' কথাটা শুনেই ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলাম। উনি আরও বললেন, একবার এক সন্ধ্যায় ফরেস্ট অফিসের নীচে একটি বাঘ ঢুকে নাকি সকাল পর্যন্ত ছিল। দরজা-জানালা বন্ধ করে সারারাত সবাই বসেছিলেন। বাঘের ভয়ে কেউ ঘুমাতে পারেননি। যাহোক, দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করে বাসার ভেতর ঢুকে গেলাম। পরদিন সুন্দরবন অভিযানে বের হলাম। তবে সারাটা দিন কদমতলা, কলাগাছিয়া, দোবেকি ও বুড়ি গোয়ালিনীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও বাঘ মামার কোনো সন্ধান পেলাম না।

এরপর বহুদিন গড়িয়ে গেছে। উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়ায় প্রায় সাত বছর অবস্থান করার কারণে সুন্দরবন যাওয়া হয়নি। তবে এসব দেশের বিভিন্ন চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্কে সাদা বাঘসহ বাঘের বিভিন্ন উপপ্রজাতির দেখা পেয়েছি। দেশে ফেরার পর ২০১০ সালে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সুন্দরবন গেলাম, কিন্তু বানর ও হরিণ ছাড়া আর কোনো স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণীর দেখা পেলাম না। ২০১৩ সালে সুন্দরবনের হাড়বাড়িয়াতে প্রথমবার বাঘের তাজা পায়ের ছাপ দেখলাম। পরের বছরও বাঘের পায়ের ছাপ ছাড়া অন্যকিছুই দেখতে পেলাম না। কয়েক বছর পর বাঘের মলের ছবিও তুললাম। এগুলো দিয়েই আশপাশে বাঘের উপস্থিতি বোঝা যায়। বাঘ বাতাসের বিপরীত দিক দিয়ে চলাফেরা করার কারণে বাঘের গায়ের গন্ধ পাওয়া সম্ভব হয় না। বাঘ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ছদ্মবেশী ও চতুর। তাই বাঘ আমাদের দেখলেও আমরা সহজে বাঘের দেখা পাই না।

যাহোক, ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে সুন্দরবনের কটকা এলাকায় অল্পের জন্য বাঘ দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। সেদিন কটকা ফরেস্ট অফিসের কাছে নোঙর করা ছোট্ট লঞ্চ 'আলোর কোল'- এ বিকেলের নাস্তা সারছিলাম। এমন সময় মাঝি এসে বললেন, 'দ্রুত চলেন, মামার খবর আছে।' দ্রুত বোটে উঠলাম এবং কটকা খাল পেরিয়ে জামতলা খালে ঢুকলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে সরু একটি খাঁড়িতে ঢুকে পড়লাম। এই খাঁড়িতে আগেও বার কয়েক পাখির খোঁজে এসেছি। কিন্তু সেদিনের অবস্থা ছিল ভিন্ন রকম। চারদিক শুনশান। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। গাছের পাতাও যেন নড়ছে না! কেমন একটা গুমোট ভাব। সচরাচর এই খাঁড়ি পাখির কলকাকলিতে মুখরিত থাকে। ক্ষণিক পর আমাদের মধ্যে অতিরিক্ত সাহসী দু'তিনজন মাঝির সঙ্গে নেমে বনের ভেতর ঢুকে গেলেন। আমরা রয়ে গেলাম বোটে বনপ্রহরীর প্রহরায়। এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ খাঁড়ির পাড়ের কাদার মধ্যে আটকে গেল। একদম তাজা পায়ের ছাপ। ছাপ অনুসরণ করতেই দেখলাম তা খাঁড়ির পানিতে নেমে গেছে এবং ওপারে গিয়ে উঠেছে। ওপারের কাদায়ও বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। তার মানে আমরা এখানে ঢোকার কিছুক্ষণ আগেই মামা এখান থেকে চলে গেছেন।

বনের গহীন থেকে ওরা ফিরে আসার পর দ্রুত বোট ছাড়লাম। কটকার জেটি ঘাটে নেমে দ্রুত টওয়ারে উঠে পড়লাম। টাওয়ার থেকে পুরো কটকা বন দেখা যায়। কটকার এই অংশটি বাঘের 'শোবার ঘর' বা 'বাঘের বাড়ি' নামে খ্যাত। এখানকার ঘন টাইগার ফার্নের ভেতর বাঘ শুয়ে থাকে। পাশেই বিশাল মাঠ। সেখানে প্রচুর হরিণ বিচরণ করে। আমরা যখন টাওয়ারে উঠলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। দুটি হরিণ মাঠে চরছে। কাজেই যা বোঝার বুঝে ফেললাম। বাঘ এখানে নেই। আগেই বলেছি এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। উপস্থিতি টের পেয়ে সরে পড়েছে।

পরের বছর আরও দুর্দান্ত ঘটনা ঘটেছে এবং বরাবরের মতো দুর্ভাগ্যের কারণে মামাকে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। ১৯শে জুলাই ২০১৯ সালের ঘটনা এটি। সকালের হালকা রোদের আলোয় কটকা টাওয়ারের প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে একটি ঝুনঝুনি বা বন অতসী গাছে সুন্দরী বায়স (সুন্দরবনের কাক) নামের মহাবিপন্ন এক প্রজাপতির ছবি তুলছিলাম। ছবি তুলতে তুলতে উড়ন্ত পতঙ্গটির পিছু পিছু আমরা বাঘের বাড়ির এতটাই ভেতরে ঢুকে গেলাম যে সুন্দরবনের রাজার কথা মাথায়ই এলো না। প্রজাপতিটির প্রজনন ক্ষেত্র আর আমাদের জাতীয় পশু সুন্দরবনের রাজা বাংলা বাঘের বাড়ি যে একই জায়গায় তা ছবি তোলায় মশগুল আমরা খেয়ালই করিনি। অথচ এর আগে যতবার কটকা এসেছি, সবসময় স্থানটি এড়িয়ে চলেছি। সে কারণেই দেশের সবচেয়ে বিরল ও মহাবিপন্ন সুন্দরী বায়স বা সুন্দরবন ক্রো প্রজাপতির প্রজনন ক্ষেত্রটিও কখনও দেখিনি। বিশ্বের আর কোথাও এই প্রজাপতিটিকে দেখা যায় না।

সেদিন সুন্দরবনের রাজার বাড়িতে যা দেখলাম তাতে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ঝুনঝুনি গাছের প্রাকৃতিক বাগানে মহাবিপন্ন পতঙ্গটির মেলা বসেছে যেন! মহা আনন্দে যখন ছবি তুলছিলাম, তখন আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণের গাইড ফেমাস ট্যুর বিডির

কর্ণধার তানজির হোসেন রুবেল কানের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, এক ঝলকের জন্য সে ও বন্যপ্রাণী আলোকচিত্রী নাজিম সুন্দরবনের রাজাকে চুপিসারে হেঁটে যেতে দেখেছেন। রক্ত হিম করা এ সংবাদে মুহূর্তেই প্রজাপতির প্রাকৃতিক বাগান মানবশূন্য হয়ে পড়ল। সবাই প্রাণ হাতে নিয়ে দ্রুত ঘাটে বাঁধা ইঞ্জিন বোটের দিকে ছুটলাম কটকা অফিসের পাশে নোঙর করা ছোট্ট লঞ্চ 'এম ভি গাংচিল'-এ ওঠার জন্য। সেদিন লঞ্চের প্রায় সকলেই বাঘ আতঙ্কে ছিলাম। এরপরও দুপুরে ভয়ে ভয়ে কটকা থেকে জামতলা সমুদ্রসৈকত পর্যন্ত একবার ঘুরে এসেছিলাম, তবে নাজিম গেল না আমাদের সঙ্গে। যাহোক, অনেক ঘোরাফেরা করেও মামার কোনো হদিস পেলাম না। তবে এভাবে বাঘ খোঁজা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অবশেষে ২০২২ সালের ২৪শে মার্চ রাতে বাঘ মামাকে দেখার প্রত্যয়ে দশজনের টিমে চারদিনের একটি কঠিন অভিযানে রওয়ানা হলাম সুন্দরবনের উদ্দেশে। মংলা থেকে রওয়ানা হয়ে কচিখালী, ডিমের চর, কটকা, জামতলা, কোকিলমনি ও হাড়বাড়িয়ার অভিযানের প্রথম দিন সকালে 'বাঘের বৈঠকখানা' খ্যাত কচিখালীতে বেশ কাছ থেকে পরপর দু'বার মামার গর্জন শুনলাম। কিন্তু বাঘ দেখায় অভিজ্ঞ গাইড ও বনপ্রহরী নিয়ে ব্যাপক খোঁজাখুঁজি করেও তার দেখা পেলাম না। বিকেলে ডিমের চরের গহীনে বাঘের মড়ির (শিকার করা প্রাণীর দেহাংশ) কাছাকাছি গিয়েও সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় ফিরতি পথ ধরলাম।

আগেই বলেছি, গত আটাশ বছর ধরে নিয়মিত সুন্দরবন যাচ্ছি প্রকৃতি-পাখি-প্রজাপতি-বন্যপ্রাণী দেখতে। এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন প্রজাতির বিরল ও দুর্লভ পাখি-প্রাণীর ছবি তুলতে পারলেও পায়ের ছাপ ছাড়া 'বাংলা বাঘ'-এর কোনো ছবি তুলতে পারিনি। বেশ কয়েকবার ওর বেশ কাছাকাছি থেকেও ওকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছি, ছবি তোলা তো দূরের কথা। কচিখালীতে বাঘের গর্জন ও ডিমের চরে বাঘের গন্ধ পাওয়ার ঠিক একমাস পর আমাদের টিম সুন্দরবনের হোমরা বা সুন্দরী খালে গাছের ডালে বসা এক অনভিজ্ঞ ও তরুণ বাঘের দেখা পেল। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ওরা ঐ বাঘটির ছবি তুলল। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেদিন আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম না। সুন্দরবনে প্রথমবার গিয়েই দুজন মাদ্রাসা ছাত্র মোবাইল ফোনের ক্যামেরা দিয়ে বাঘের ছবি তুলল।

তবে ভারতের রাজস্থানের 'রণথামভোর জাতীয় উদ্যান' আমাকে হতাশ করেনি। ওখানে পরপর দুদিন দুটি আলাদা আলাদা এলাকায় দুটি ভিন্ন বাঘের দেখা পেয়েছি ও চমৎকার সব ছবি তুলেছি। রণথামভোরের 'বাংলা বাঘ' দেখে আমি তৃপ্ত এ কারণে যে, ওখানকার ও আমাদের সুন্দরবনের বাঘ জিনগতভাবে সবচেয়ে কাছাকাছি। বিশ্বের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সমন্বয়ে সম্পন্ন এক গবেষণার ফলাফলে জিনগতভাবে রণথামভোরের বাঘের সঙ্গেই সুন্দরবনের বাঘের সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া গেছে। তাই ওরাও রয়েল বেঙ্গল বাঘ নামেই পরিচিত।

প্রতিবছর ২৯শে জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবস বা আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস পালিত হয়। বাঘ সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিবছর দিনটি পালন করা হয়। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত বাঘ সম্মেলনে এই দিবসটির সূচনা হয়। বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য বাঘের প্রাকৃতিক আবাসভূমি রক্ষা ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে বাঘ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও ভীতি দূর করা। বাঘ বাংলাদেশের জাতীয় প্রাণী হওয়ায় এই দিবসের গুরুত্ব এদেশে অনেক বেশি। একসময় সারা দেশজুড়ে বাঘের উপস্থিতি থাকলেও বর্তমানে বাঘ এদেশে অত্যন্ত বিরল ও মহাবিপন্ন প্রাণী এবং বিশ্বব্যাপী বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

একসময় পুরো বাংলাদেশজুড়ে বাঘ বাস করলেও পঞ্চাশের দশকের পর ওরা কেবল সুন্দরবনে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যদিও সুন্দরবন বাঘের বসবাসের জন্য উপযুক্ত নয়। সর্বশেষ ১৯৬২ সালে পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধায় শেষ গ্রামীণ বনের বাঘটি মারার পর এদেশের গ্রামে আর কোনো বাঘ দেখার রেকর্ড নেই। বাংলাদেশে সর্বমোট কতগুলো বাঘ আছে এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন সময় এদেশের সুন্দরবনে বাঘ শুমারির মাধ্যমে ৩০০-৫০০টি বাঘের উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে ক্যামেরাট্র্যাপভিত্তিক বাঘ শুমারিতে সুন্দরবনে ১০৬টি বাঘের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, যা ২০১৮ সালের শুমারিতে ৮% বেড়ে ১১৪টি হয়। এটিই এখন এদেশের বাঘের সর্বমোট সংখ্যা।

তবে আগের তুলনায় ইদানীং সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কারণ গত দুবছর ধরে প্রায়ই বাঘ সুন্দরবন ভ্রমণকারীদের নজরে আসছে। ২০২৩-২০২৪ সালে সুন্দরবনে বাঘের আরেকটি ক্যামেরাভিত্তিক শুমারি শেষ হয়েছে। ২৯শে জুলাই ২০২৪-এ এর ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করার কথা থাকলেও দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ঘোষণা করেনি বন বিভাগ। তবে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এই জরিপে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির আভাস মিলেছে। অসমর্থিত সূত্রে যা জানা গেছে তাতে ১২টি বাঘ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাঘ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর সুরক্ষা, প্রজনন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাঘের শিকার প্রাণী বা খাদ্যের উৎস বাড়াতে কাজ করতে হবে বন বিভাগকে।

বর্তমানে এদেশের চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্কগুলোতে যেসব বাংলা বাঘ রয়েছে, তার একটিও কিন্তু সুন্দরবনের বাঘ নয়, বরং সবগুলোই এসেছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্ক থেকে। যদিও ভারতীয় সুন্দরবন, রণথামভোর, সারিস্কা ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের বাঘের সঙ্গে বাংলাদেশের বাঘের খুব মিল, কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চল, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের বাঘের সঙ্গে জিনগত পার্থক্য দেখা যায়। সূত্র মতে, বর্তমানে এদেশের বাঘ রক্ষার জন্য কিছু প্রকল্প চলমান থাকলেও দেশের গৌরব সুন্দরবনের রাজা চোরা শিকারিদের হাত থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। অতএব, বাঘ রক্ষার প্রতি আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে একদিন হয়ত সুন্দরবনের রাজা 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বা 'বাংলা বাঘ' চিরতরে হারিয়ে যাবে পৃথিবী থেকে।

প্রফেসর ড. আ ন ম আমিনুর রহমান: পাখি ও বন্যপ্রাণী প্রজনন ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, বন্যপ্রাণী প্রজনন ও সংরক্ষণ এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজননতান্ত্রিক জৈব-প্রযুক্তি গবেষণাগার ও বিভাগীয় প্রধান, গাইনিকোলজি, অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ বিভাগ

মির্জা নূরুল হুদার জীবন ও কাল: একটি পর্যালোচনা

ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ

MIRZA NURUL HUDA: A MEMOIR

MY SEVEN DECADES' JOURNEY THROUGH BRITISH INDIA, PAKISTAN AND BANGLADESH

ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আমার সাত দশকের সফর: একটি স্মৃতিকথা, মির্জা নূরুল হুদা; সম্পাদক: ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ; প্রকাশক: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০২১।

দেশে-বিদেশে ড. এম এন হুদা নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত মির্জা নূরুল হুদা নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর কীর্তিমান বাঙালিদের মধ্যে একজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের এক অসামান্য পণ্ডিত ও অধ্যাপক হিসেবে পেশাগত ভিত্তি গড়ে তোলার পর তিনি মাঝেমধ্যে শিক্ষাঙ্গণের বাইরে গিয়ে একজন সফল কারিগরি বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাঁর পদচিহ্ন রেখে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করার পর তিনি ব্রিটিশ ভারতে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে ১৯৪৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগ দিয়েছিলেন। এরপর ১৯৬২-১৯৬৫ মেয়াদে প্রেষণে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে চাকরি করার সময় তিনি 'দুই প্রদেশের দুই অর্থনীতি' তত্ত্বটি জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। মূলত এর ভিত্তিতেই ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবিটি ঘোষিত হয়েছিল। এরপর ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানে প্রদেশের গভর্নর মোনেম খান গদিচ্যুত হওয়ার পর তিনি কয়েকদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায় পরিকল্পনা ও অর্থমন্ত্রী হিসেবে ১৯৭৬-১৯৮১ সময়কালে অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এরপর ১৯৮১ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৮২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি ছিলেন দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি।

বর্ণিত গ্রন্থটি ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে মির্জা নূরুল হুদার সাত দশকব্যাপী সফর এবং তাঁর জীবন ও কর্মের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। যদিও ড. হুদা ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁর প্রয়াত স্ত্রী অধ্যাপক উম্মে কুলসুম সিদ্দিকা বানু (মৃত্যু ২০০৮ সালে), জ্যেষ্ঠ কন্যা সিমীন মাহমুদ (মৃত্যু ২০১৮ সালে), কনিষ্ঠ কন্যা জারীন আহমেদ এবং সম্পাদক ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াসের ফলেই স্মৃতিকথাটি আলোর মুখ দেখেছে।

ড. হুদা বইটির শিরোনাম 'স্ট্রে থট্‌স' বা 'বিক্ষিপ্ত ভাবনা' রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি এটার যুক্তি দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'আনুষ্ঠানিক ও কারিগরি দৃষ্টিকোণ থেকে আমার এসব প্রবন্ধ, ভাষণ, টীকা ইত্যাদি একটি সমন্বিত এককের রূপ দেয় না। এগুলো জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ও সময়ে পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, সে ব্যাপারে আমার ধ্যান-ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে।' প্রকৃতপক্ষে, যেটা ড. হুদার স্মৃতিকথাকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলেছে সেটা হলো সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ-সম্পর্কিত উপমহাদেশীয় ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক ও সমান্তরাল বর্ণনা। বইটির সম্পাদক আরও যোগ করেছেন, 'তাঁর স্মৃতিকথাটি তাঁর নিজের লেখা বিবরণ এবং কয়েকটি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংকলন করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি মূলত একটি স্মৃতিকথা, যদিও অধ্যাপক হুদা অর্থনীতির কিছু জটিল বিষয়ের ওপর বিশদভাবে আলোচনা করেছেন যা অর্থনীতিবিদদের ক্ষুধা মেটাবে।'

স্মৃতিকথাটি সামগ্রিকভাবে তিনটি অংশ বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলো হলো: ব্রিটিশ ভারতে জীবনের সূচনাকাল (১৯১৮-১৯৪৭); পাকিস্তান আমলে আমার জীবন (১৯৪৭-১৯৭১); এবং আমার জীবনের বাংলাদেশ পর্ব (১৯৭১-১৯৯১)। প্রথম অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে আছে টাঙ্গাইলে জন্ম ও স্কুলে গমন, রাজশাহী কলেজে ছাত্রত্ব এবং স্নাতক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় ১৯৩৩ সালে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও তিনি ১৯৩৫ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন; তিনি স্টার-মার্কস বা ৭৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছিলেন। এরপর ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় রাজশাহী কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সমগ্র রাজশাহী বিভাগে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করাসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে পড়ার সময়ও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন যখন অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। স্নাতক পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় ১৯৪০ সালে রাজা কালী নারায়ণ বৃত্তিও তিনি পেয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব সমাপ্তির পর ড. হুদা প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খানের করটিয়া সা'দত কলেজে কিছুদিন লেকচারার হিসেবে কাজ করেন, যা তাঁর শিক্ষকতার দক্ষতাকে শানিত করেছিল। এরপর তিনি ১৯৪২ সালের নভেম্বরে তাঁর মাতৃশিক্ষায়তন

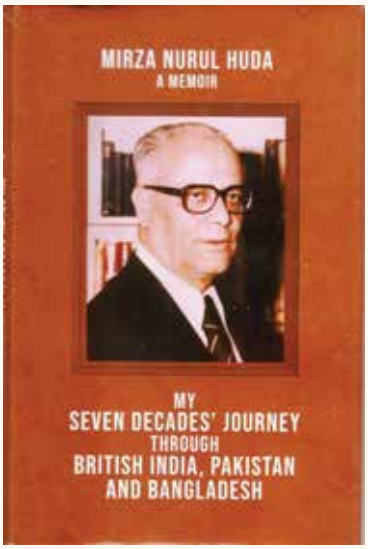

রাজশাহী কলেজে অর্থনীতির লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলায় দুর্ভিক্ষ চলাকালে ১৯৪৩ সালের শেষদিকে তিনি কলকাতায় বিসিএস (বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি এই পরীক্ষায় বেশ ভালো ফল করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ পান। তাঁর প্রথম পদায়ন হয়েছিল ২৪ পরগনা জেলা সদর আলীপুরে। ১৯৪৫ সালে ড. হুদা তৎকালীন বাংলা প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের (ভারত ভাগের পর পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি) জ্যেষ্ঠ কন্যা উম্মে কুলসুম সিদ্দিকা বানুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এর পরের বছরই যুক্তরাষ্ট্রের ইথাকায় অবস্থিত কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রামীণ ও কৃষি অর্থনীতির ওপর পিএইচডি করার জন্য তিনি নির্বাচিত হন। মজার ব্যাপার হলো, ১৯৪৭ সালের জুন মাসে তিনি ব্রিটিশ ভারতের নাগরিক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন, আর রেকর্ড দুই বছর সময়ে পিএইচডি কোর্স সম্পন্ন করে তিনি ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে নব্য-স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি যখন পাকিস্তানে ফিরে এলেন, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ও তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে রিডার হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে রাজি করালেন। শিক্ষকতা যেহেতু তাঁর তরুণ বয়স থেকেই পছন্দের পেশা, তাই ঢাকার জেলা প্রশাসনে সিভিল সার্ভিসের চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে তিনি ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন।

১৯৫০-এর দশকে ড. হুদা অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন সরকারি প্যানেলে সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। এর মধ্যে ছিল পাকিস্তানের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য পরিকল্পনা বোর্ড ও পরিকল্পনা কমিশনের মতো সংস্থাকে উপদেশ দেওয়া। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তান অর্থনীতি সমিতির একটি বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করে। এখানে ড. হুদা, ড. মাযহারুল হক, আব্দুর রাজ্জাক এবং ড. নূরুল ইসলামসহ কয়েকজন বাঙালি অর্থনীতিবিদ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, যাতে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানে দুই অর্থনীতির অস্তিত্ব ও সেটা বিবেচনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়। এর সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ: 'পাকিস্তান হলো একটি অনন্য রাষ্ট্র। এর দুটি অংশ ভারতের এক হাজার মাইল দূরত্ব দ্বারা বিচ্ছিন্ন। পাকিস্তানের দুই অংশের সম্পদ ও উন্নয়নের ইতিহাসও ভিন্নতর। দুই অংশে যে দুটি ভিন্ন অর্থনীতি রয়েছে এটা বিবেচনায় রেখেই পাকিস্তানকে উন্নত করতে হবে। পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যেন দেশটিতে দুই ভিন্ন অর্থনীতি এবং দুটি উৎপাদন ও ভোগের অঞ্চল বিদ্যমান।'

তবে কেবল প্রাদেশিক উন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রেই পাকিস্তান সরকার আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটটি বিবেচনায় রাখত; কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় সেটা বিবেচিত হত না। আবার পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু অববাহিকা প্রকল্পের মতো পরিকল্পনাবহির্ভূত বিশাল ব্যয়ের ক্ষেত্রে সেটা বিবেচনায় রাখা হত না। বিষয়টি উত্থাপনের পরও কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটটি আংশিকভাবে ধর্তব্যে নিত, আর কেবল জাতীয় পরিকল্পনায় আঞ্চলিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিত। এই পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাজেটের ৭০ শতাংশ সম্পদই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছিল; আর পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হতো মাত্র ৩০ শতাংশ। সরকারি পরিসংখ্যান ব্যবহার করে ড. হুদা তাঁর স্মৃতিকথার পরিশিষ্ট অংশে এটা পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন।

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পরও ড. হুদাসহ বাঙালি অর্থনীতিবিদদের একটি দল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য 'দুই অর্থনীতি তত্ত্ব' প্রচার করছিলেন। কিন্তু আইয়ুব খানসহ পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা একে পাকিস্তান হতে স্বাধীন হওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানিদের একটি ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছিল। ১৯৬১ সালের মে মাসে আইয়ুব খান যখন ঢাকা সফর করেন, তখন তিনি ড. হুদাসহ কয়েকজন স্থানীয় অর্থনীতিবিদকে আলোচনা করার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন; কিন্তু টাঙ্গাইলে থাকায় ড. হুদা তাতে অংশগ্রহণ করেন নাই। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তখন ড. হুদাসহ বাঙালি অর্থনীতিবিদদের একটি দলকে 'দুই অর্থনীতি'র উপর একটি গবেষণাপত্র লেখার জন্য বলেছিলেন। এই দলে আরো ছিলেন অধ্যাপক মাযহারুল হক, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, এবং ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। তাঁরা গবেষণাপত্রটি যথাসময়ে জমা দিয়েছিলেন, যাতে দেশের অদ্ভুত ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে আমলে নিয়ে পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়, যে বৈশিষ্ট্যের কারণে দেশের এক অংশ হতে অন্য অংশে মানুষ ও বস্তুর পরিবহণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল।

১৯৬১ সালে আইয়ুব খানের পরবর্তী ঢাকা সফরে আমন্ত্রিত হয়ে ড. হুদা ও ড. মাযহারুল হক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল আযম খানের সঙ্গে একটি কক্ষে বসেছিলেন। তবে বাঙালি অর্থনীতিবিদদেরকে দেখেই আইয়ুব খান প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন এবং গবেষণাপত্রের কথা উল্লেখ না করেই ক্রোধান্বিতভাবে অপমানসূচক মন্তব্য করলেন। এরপর তিনি

তাঁদের বক্তব্য জানতে চাইলেন। কথা বলার সুযোগ পেয়ে ড. হুদা গবেষণাপত্রের যে অংশগুলোতে দাগ দিয়ে রেখেছিলেন সেগুলোর সহায়তায় এর সারমর্ম আইয়ুব খানকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তিনি সাহস সঞ্চয় করে বললেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমরা গবেষণাপত্রটিতে ঠিক এটাই বোঝাতে চেয়েছি। আপনার উপদেষ্টারা আপনাকে যা বুঝিয়েছে তা এক বারেই ভিন্ন কিছু। ... আমরা ভাগ্যবান যে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তা না হলে আমাদের এবং আমাদের তত্ত্ব সম্পর্কে আপনার ধারণা উপদেষ্টাদের মতোই নেতিবাচক থাকত। ... সেক্ষেত্রে আপনি পাকিস্তানের জন্য এমন সব নীতিমালা প্রণয়ন করতেন যেগুলো মিথ্যা ও ভয়ানক সব অনুমানের ভিত্তিতে রচিত হতো।' এরপর প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের হাবভাবে বিশাল পরিবর্তন এলো এবং তাঁকে পরিবর্তিত মানুষ মনে হলো। এরপর সাক্ষাৎকারটি বন্ধুত্বপূর্ণ আবহে সমাপ্ত হয়েছিল; পরিস্থিতির কীভাবে উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ও বাঙালি অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কিছু ধারণা বিনিময়ও তখন ঘটেছিল।

এর পরের বছরই ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে ড. হুদাকে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়। সেখানে কমিশনের চেয়ারম্যান ও পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের সঙ্গে তাঁর প্রায়শই মতানৈক্য হত। কিন্তু ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের আগ পর্যন্ত তিনি কমিশনে 'দুই অর্থনীতি তত্ত্বে'র ভিত্তিতে কাজ করে গিয়েছিলেন। চার বছর পর পূর্ব পাকিস্তানে একটি গণ-অভ্যুত্থান ঘটে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালের ২৩শে মার্চে কী পরিস্থিতিতে তিনি প্রাদেশিক গভর্নরের পদে শপথ গ্রহণ করেছিলেন আর তার ঠিক দুদিন পরেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় কীভাবে সামরিক আইন জারি করলেন তার বর্ণনা স্মৃতিকথাটিতে সন্নিবেশিত আছে। ইয়াহিয়া ড. হুদাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে তাঁকে এক মাস সময় দেওয়া হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রাখেননি। স্মৃতিকথায় ড. হুদা উল্লেখ করেন: 'পূর্ব পাকিস্তানে আমার গভর্নরশিপের দুটি দিন আমার হৃদয়কে আশায় পরিপূর্ণ করেছিল, আর পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও আমি আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আমার ও অন্যদের এসব আশাবাদকে সামরিক জান্তা নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল।'

ড. হুদা পরের মাসেই অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক হিসেবে তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে ফিরে এসেছিলেন। ১৯৭০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের টালমাটাল পরিস্থিতির কথা তাঁর স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে। উঠে এসেছে ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের কালরাতে 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর আওতায় নিরীহ বাঙালি নাগরিকদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের নিধনযজ্ঞের কথা। সে সময় ড. হুদা, তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পার্শ্ববর্তী একটি বাংলোয় থাকতেন; তাঁর একমাত্র পুত্র নাজমুল ছিল জার্মানিতে। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, 'সেনাবাহিনী হলের ভেতরে ঢুকে সেখানকার অনেক বাসিন্দাকে, আর নিকটবর্তী বস্তি ও সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে বসবাসকারী অনেক নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছিল।... এটা পরিষ্কার ছিল যে অন্যান্য আবাসিক হলসহ ক্যাম্পাসের সর্বত্র এই গল্পটির পুনরাবৃত্তি ঘটছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসস্থলেও একই প্রতিশোধপরায়ণতা নিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছিল। এটা পরিষ্কার ছিল যে সর্বোচ্চ হতাহত নিশ্চিত করার জন্য অভিযানটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল, যাতে করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানিরা হাঁটু ভেঙে বসে আত্মসমর্পণ করে'।

২৬শে মার্চ সকালে ড. হুদার পরিবারের জন্য আরও ভয়ংকর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছিল, যখন তাঁদেরকে হত্যা করার জন্য পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা ঘরে ঢুকে পড়ল। সৈন্যরা সামনের দরজাটি ভেঙে জোরপূর্বক ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করেছিল। তারা ড. হুদার দিকে বন্দুক তাক করে তাঁকে বাইরে আসতে বলল। তবে বাংলোর বাইরে যাওয়ার পরমুহূর্তে ড. হুদার স্ত্রী ও দুই কন্যা দৌড়ে এসে ভাঙা ভাঙা উর্দুতে বলেছিল, তিনি যেখানেই যান তাঁর সঙ্গে তাঁরাও যাবেন। সৈন্যরা এতে ঘাবড়ে গিয়ে আবারও বাসার ভেতরে এলো। এবার তারা বাংলো থেকে কয়েকটি দামি জিনিস কবজা করে চলে গেল। মাত্র দুই ঘণ্টা পরই পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি দল বাসায় এসেছিল, আর একজন সৈন্য ড. হুদার বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়েছিল। কিন্তু ড. হুদার স্ত্রী তাঁকে আগলে রেখেছিলেন আর জ্যেষ্ঠ কন্যা তাঁর বুক থেকে বন্দুকের নল সরিয়ে দিয়েছিল; এর ফলে হতবিহ্বল হয়ে সৈন্যটি আর গুলি চালাতে পারেনি। সৈন্যরা তখন কাউকে হত্যা না করেই চলে গিয়েছিল। এর পরদিন কারফিউ শিথিল হওয়ার পর ড. হুদা ও তাঁর পরিবার বাংলোটি ছেড়ে হাটখোলায় এক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে সাড়ে তিন মাস থাকার পর তাঁরা ধানমন্ডিতে নিজগৃহে চলে যান।

স্মৃতিকথার তৃতীয় অংশে বাংলাদেশ পর্বের কথাও বলা হয়েছে। তবে এই অংশটি কিছুটা সংক্ষিপ্ত। এখানে বর্ণিত ঘটনাবলির মধ্যে আছে ১৯৭৫-এর নভেম্বর থেকে ১৯৮১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত পরিকল্পনা, বাণিজ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হিসেবে ড. হুদার ভূমিকা এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর ১৯৮১ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার জয়ী হওয়ার পর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর চার মাস দায়িত্ব পালনের কথা। স্মৃতিকথাটি রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদ, গবেষক এবং ইতিহাসবেত্তাদের জন্য একটি অবশ্য-পাঠ্য বই।

ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ: অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস-এর প্রাক্তন এডিটোরিয়াল কনসাল্টেন্ট, ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক; hahmed1960@gmail.com

সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তি

মো. নাইমুল ইসলাম খান অনিক

পরিবারে আমরা মোট চারজন সদস্য, মা-বাবা, আমি এবং আমার ছোটো ভাই। ছোটো গল্প, নভেল এবং কবিতা পড়তে ও আবৃত্তি করতে পছন্দ করি। অভিনয়ে ক্যারিয়ার গড়ার তীব্র বাসনা থাকার দরুন প্রচুর সিনেমা দেখা হয়। শান্তিকামী মানুষ, তাই যারা অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ লালন করে তাদের অপছন্দ করি। অপছন্দটাও খুব বৃহত্তর পরিসরে যে তা নয়। আমি মূলত এসব নিয়ে কনসার্ন নই।

জুলাইয়ের ২ বা ৩ তারিখে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের খবর দেখি, তবে অগ্রাহ্য করেছিলাম প্রথমে। তারপর ১৪-১৫ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হামলা দেখে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এরপর ওদের হল থেকে বের করে দেওয়া, পানি বন্ধ করা এসব দেখে মানতে পারছিলাম না। সবচেয়ে বেশি ট্রিগার করেছে 'রাজাকারের বাচ্চা- নাতিপুতি' শব্দটায়।

তারপর প্রথম ১৬ তারিখ বেড়িবাঁধ সড়ক অবরোধ করে আমরা আন্দোলন করি। ১৭ তারিখে এলাকায় ছাত্রলীগের উত্তাপে বাসা থেকে বের হতে পারিনি। এরপর ১৮ তারিখ একেবারে ভোর ৪টা বাজে উঠে ৫টা/ ৬টা নাগাদ বাসা থেকে বের হই। আর সেদিন-ই গুলিবিদ্ধ হই। আমি গুলিবিদ্ধ হবার সময় বিকাল ৪:৪২-৪:৪৩ নাগাদ, ১৮/০৭/২০২৪ তারিখ। স্থানটা উত্তরা আজমপুর থানার কাছেই।

সেইদিনের বিকেলের আকাশটা বেশ ভালোই নীল ছিল, মাঝে মাঝে আবার শিমুল তুলার মতো ছড়ানো-ছিটানো মেঘে আচ্ছন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্লোগানে মুখরিত চারদিক। আমার থেকে পুলিশের দূরত্ব প্রায় ৫০ কিবা ১০০ গজ (আনুমানিক)। আমি পুলিশের দিকে তাকিয়ে, পুলিশ আমার দিকে। আমাদের ওপর গুলি বর্ষণ, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ এবং টিয়ারসেল গ্যাস ছাড়ে পুলিশ।

আশপাশের বাড়িগুলোর ছাদেও রাইফেল, মেশিন গান তাক করে এলোপাথাড়ি গুলি করায় মেতে ছিল পুলিশ ও ছাত্রলীগ; সাথে র‍্যাবও সহযোগী। বিকাল ৪:৪০— এর পর হঠাৎ একটা বিকট শব্দে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। (আমাকে নিয়ে করা ভিডিও'র সময় দেখে এবং গুলি লাগার পর মুহূর্তে সুলতানের ফোন আসা থেকে সময়টা নিশ্চিত হই সুস্থ হবার পর।)

যে যেখানে পারে তড়িঘড়ি করে সরে যাবার চেষ্টায় ব্যাকুল হয়ে উঠছে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানেই আমার পেটে লোহার পাতের মতো কিছু একটা ছিটকে লাগার অনুভব হলো। ঝুন করে একটা শব্দও হয়েছিল। ভেবেছিলাম বেল্টের বকলেসে হয়ত সাউন্ড গ্রেনেডের কোনো অংশ লেগেছে, নয়ত রাবার বুলেট। আঘাতটা যে এতটা ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক হবে তা একেবারেই ভাবিনি। মুহূর্তেই পেটের মাঝে প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক ব্যথায় চারদিক অন্ধকার হতে শুরু করল। শার্টটা তুলে পেটের দিকে তাকিয়ে দেখি ইঞ্চিখানেক জায়গা নিয়ে একটা ক্ষতচিহ্ন।

অসাড় ক্লান্ত দুই চোখে কেবল চারদিকটা ধীরে ধীরে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। সেই সাথে পেটের ক্ষতস্থানের ভেতরের যন্ত্রণায় তার আশপাশের পেশিগুলো মনে হচ্ছিল মাঝখানের একটি জায়গায় জড়ো হয়ে আসছে। আমি একবারের জন্য শার্টটা উঁচু করে পেটের দিকে তাকালাম। দেখলাম নাভির একদম নীচ থেকেই এক ইঞ্চির মতো গর্ত করে কিছু একটা ঢুকেছে। নিজের উপস্থিত ধারণার বলে ভেবে নিলাম— এটা সজোরে আঘাত লাগা রাবার বুলেটের ঘা, অথবা সাউন্ড গ্রেনেডের লোহার পাত হবে হয়ত। কিন্তু ছিদ্রটা হবার কারণ কী তা আমার মনে বার বার নাড়া দিতে লাগল। মনে হতে লাগল, 'তবে কি রাবার বুলেট পেটে ঢুকেছে'। নিজেকে প্রশ্ন করলাম— 'যদি তাই হয় তবে এত ক্ষুদ্র বুলেটের কারণে এতটা যন্ত্রণা হবার কী আছে?'

আমি 'মা..., মা... গো' বলে আর্তনাদ করে যন্ত্রণা থেকে মানসিক মুক্তির চেষ্টা করলাম। পা দুটো এক মুহূর্তের জন্যেও থামেনি। প্রাণ ভিক্ষা চাইবার প্রবল আগ্রহ নিয়ে আমার পা চলছে ভিড়ের পেছনে ফাঁকা রাস্তার দিকে। পেটের যন্ত্রণা তখনও ক্ষণে ক্ষণে বেড়েই চলছিল, আর মনে হচ্ছিল পেশিগুলো এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

কোলাহলে শব্দের খুব একটা জোর ছিল কী ছিল না তা মনে নেই। কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর আর্তচিৎকার যেভাবে আমার বুক ফেটে বেরিয়ে আসছিল তা হয়ত সেখানকার আমার সব ছাত্র বন্ধুদের স্লোগানে মুখরিত শব্দের থেকেও ঢের বেশি হয়েছিল। মানুষজন একে একে আমার দিকে তাকানো শুরু করছে। বা হাতে পেট চেপে ধরে আমি হাঁটছি কী দৌড়াচ্ছি তাও বুঝে উঠতে পারিনি। শুধু এতটুকু জানি আমার আর্তচিৎকার ছিল এই বলে যে, 'ভাই কেউ আমারে বাঁচান, আমার প্যাটে গুলি লাগছে'। রাস্তার পাশের অনেকেই শুনল। দূরে ওভার ব্রিজের নীচে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থেকে একজন বলল, 'লাগছে গুলি'? উনি হয়ত আমার ভেতরকার সিরিয়াসনেসটা বুঝতে পারেননি তখন, তাই সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে এমন মন্তব্য করেন। আন্দাজ করে বলছি, আমি গুলিবিদ্ধ হবার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই হয়ত কেউ সাহায্য করার জন্য আসেন। ২০-৩০ গজ দূর থেকে একজন ছাত্র দৌড়ে আসেন। তার সাথে আরও ২-১ জন তারা আমার হাত ধরে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এরই মধ্যে আমার পায়ের অস্বাভাবিক গতি দেখে আরও একজন ছাত্র দৌড়ে আসেন আমাকে উঁচুতে তোলবার জন্য। বয়সে আমার ছোটো তবে বেশ মানবিক। (৫ই আগস্ট পরবর্তীতে আমি ওকে খুঁজে বের করি, আহাদ নাম)। ওর সাথেও বেশ কয়েকজন ছাত্র দৌড়ে আসছিল আমাকে ধরার জন্য। তবে আহাদ সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যে আমাকে দ্রুত ফার্স্ট এইডের জন্য কাঁধে তুলে নিতে আসে। আহাদের ছোটো ভাই তখন রাবার বুলেটে আহত হয়ে

কাতরাচ্ছিল, কিন্তু আমার ওপর এতটা গুরুত্ব দেওয়ার কারণ প্রায় অজানা এখনো। নৈতিক ও মানবিকবোধ এমন এক পদার্থ, যা হয়ত পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানী বা দার্শনিক যুক্তি দিয়ে তার কারণ প্রমাণ করতে পারেনি।

আমাকে ধরেই ছেলেটি কাউকে ডাকাডাকি কিংবা কারোর সাহায্যের ধারধারেনি। দুই হাত দিয়ে তুলেই তার কাঁধে নিয়েছেন। আমি তখনও পেটে হাত চেপে আছি। আমার মুখ থেকে শুধু কয়েকটি শব্দ বের হচ্ছিল। এর মধ্যে কালিমা তাইয়্যেবা অন্যতম। বাকি শব্দগুলো ছিল– 'মা... মা...গো... আহহহ...', 'ভাই কষ্ট হইতাছে অনেক পেটে, ভাই আমারে বাঁচান ভাই, আমি মারা গেলে আমার আম্মু বাঁচবে না ভাই'।

আমার চারপাশটা গোটা অন্ধকার, চোখে যেন ফজর কিংবা মাগরিবের ওয়াক্তের মৃদু আলো। মানুষের কোলাহল খুব একটা কানে আসেনি, কানের ভেতরে কী যেন একটা শব্দ। ধারণা ছিল না আমার পেটের জখম ঠিক কতটা বিপজ্জনক। তখনও অজ্ঞান হইনি, হতে চাইনি। ভেবেছিলাম, এক মুহূর্তের জন্য যদি আমার আর্তচিৎকার বন্ধ হয়ে যায়, এই শূন্যস্থানে আমার পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ না থাকার আশঙ্কা আছে। মনে হচ্ছিল ছিদ্রটা দিয়ে ডাইনোসরের দাঁত ঢুকেছে। শারীরিক যন্ত্রণার থেকে মানসিক যন্ত্রণা বেশি পীড়াদায়ক। তাই, আমি পেটের ব্যথার থেকে আমার অভ্যন্তরীণ ভয়ের দ্বারা বেশি যন্ত্রণা অনুভব করি। তবুও যেন কীসের এক শান্তি মনে বাঁধাই করা। এই শান্তি কোনোকিছুকে ভয় করতে চাচ্ছিল না। মানুষ যে কৃত্রিম শান্তি সৃষ্টি করে তার আত্মাকে শান্ত করার চেষ্টা করে, তা শয়তান অচিরেই ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু পরম স্রষ্টা (আল্লাহ) যে অফুরন্ত শান্তি দিয়ে পীড়িত বান্দাকে মুমূর্ষু অবস্থায়ও জান্নাতের উৎকৃষ্ট স্বাদ দেয়, তা শয়তান নষ্ট করতে পারে না।

অল্পক্ষণের মাথায় সুলতান (বন্ধু) সামনে পড়ে। কিছুক্ষণ আগে ফোন কলে সুলতান আমাকে পেছনে ডেকেছিল। আমি গাফিলতি আর ঘাড়তেড়ামি করে বলেছিলাম 'ধুর বেটা এত ডরাইস না। তুই আয় এইখানে ঝামেলা হইব না'। সুলতানকে আমি দেখেই একজনকে ইশারায় ডেকে বলি, 'ভাই ঐ জে আমার বন্ধু দাঁড়ায় আছে, ওরে ডাক দেন কেউ'। আমিও ডাক দিলাম 'সুলতা...ন' বলে। সুলতান ফোনের ক্যামেরাটা অন করে আমার দিকে তাক করেই দৌড়ে আসে 'বন্ধু কী হইল তর?' এই মুহূর্তে এরকম বোকামি দেখে আমার হাসা উচিত ছিল কিন্তু নিরুপায় হয়ে কাঁদছিলাম। এর মাঝে আরো কয়েকজন আমার দিকে এসে জড়ো হলো। আমার চোখ অন্য মানুষের দিকে। সাধারণ জনতাও ছিল আমাদের পাশে। কয়েকজন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আমার আর্তচিৎকার শুনছিল। এরই মাঝে আমার অচেনা বহু প্রকৃত বন্ধুদের সমাগম বেড়ে যায়। তারা যথেষ্ট চেষ্টা করে আমাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে। সময়ের গতির সাথে তাল মিলিয়ে ক্ষতস্থানে যন্ত্রণা যেন দিগুণ হয়ে উঠছে। চাইলেই আমি সব শক্তি দিয়ে চিৎকার করতে পারছিলাম না। অজ্ঞান হব যে তারও সুযোগ ছিল না। সকালে বাসা থেকে একটা ডিম আর চা-বিস্কুট খেয়ে যে এনার্জি নিয়ে বের হয়েছিলাম, তা বাসা থেকে বের হয়ে নর্শিংহপুর থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত বাস না পেয়ে ১ ঘণ্টার পথ হাঁটাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখানে এসে দুপুরের খাবার হিসেবে দুই স্লাইস ড্রাই কেক আর পানি খেয়েছি। মাঝখানে দুটো কলা খেয়েছিলাম।

আমার ডান পকেটে ফোন বাজছিল কিছুক্ষণ ধরে। আমি ফোন রিসিভ করার অবস্থায় নেই। এর মধ্যে একজন বলল, ফোন আমার কাছে দিন ভাই। আমি তখন তাকিয়ে দেখি রিয়ান (কলেজের বন্ধু) বাম দিকে তাদের সাথে দ্রুত পা ফেলছে দৌড়ানোর মতো। আমি বললাম, না ভাই আমার ফ্রেন্ড আছে রিয়ান, ওকে দিই। রিয়ানের হাতে ফোনটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম আব্বু-আম্মু কল করলে কিছু একটা সান্ত্বনা দিবে। আব্বু-আম্মু ফোন দিয়ে যেন কোনোভাবেই এই মুহূর্তে এই সংবাদ না শোনেন। মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে উঠলেও আমার পারিবারিক স্নেহ ছিল রাজপুত্রের মতো। ছোটোবেলায় পেট খারাপ হতে পারে ভেবে আব্বু আমাকে বোতলের পানি (মিনারেল ওয়াটার) কিনে খাওয়াতেন। তাদের কাছে আমি এখনো আমার থেকে ১২ বছরের ছোটো ভাই ওমরের (অহন ডাক নাম) মতো।

তখন একজন ডাক্তারের কাছেই শুনতে পাই এটা আসলে সত্যিকারের রাইফেলের বুলেট। পরবর্তীতে যখন নিজ চোখে দেখি, তখন নিজের কাছে গা শিউরে ওঠার মতো ভয়ংকর লেগেছিল। সময়টা কতটুকু যন্ত্রণাদায়ক আর কষ্টকর ছিল তা হয়ত আমি ছাড়া অন্য কারোর অনুধাবনযোগ্য নয়। এসব ছবি, ভিডিও দেখলে মনে হয়– 'এই বুঝি মগজ ভেদ করে গুলি ঢুকবে; নয়ত তলপেট ভেদ করে বেড়িয়ে যাবে ওপাশ থেকে'।

আমার সহযোদ্ধা ও সহপাঠী ৩ জন বন্ধু এবং আন্দোলনের কিছু অচেনা সহযোদ্ধাদের সহায়তায় কোনোভাবে কিছুক্ষণের ভেতর আমাকে সেক্টর ৭-এ স্কয়ার টাওয়ারের পেছনে একটা ডায়াগনস্টিকের নীচে পার্কিংয়ে ফার্স্ট এইডের জন্য আমার

আশ্রয় হয়। সেখানে মেডিকেলের স্টুডেন্ট, নার্সিং স্টুডেন্টরা ফার্স্ট এইড করছিলেন। আমাকে নিয়ে গেলে একজন ডাক্তার ডাকা হয় সম্ভবত। তিনি শার্টটা উঁচা করে প্যান্টের বেল্ট খুলতে বলেন। কেউ একজন বেল্ট ঢিলা করে প্যান্ট নীচে নামিয়ে দিলেন। আমি ডাক্তারকে অনুরোধ করলাম আমাকে বাঁচান ডাক্তার। আমার প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। ডাক্তার আমার পেটের ক্ষতস্থানটি দেখেই বললেন, 'এত রিয়েল বুলেট, হাসপাতালে নিয়ে যাও'। সেই সাথে সামান্য ভায়োডিন দিয়ে দিলেন হয়ত ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করার জন্য। আমাকে সেই জায়গা থেকে নামিয়ে একটা রিকশায় তোলা হলো। এর মধ্যে বন্ধু ঈসা চলে এলো দেখলাম। একটা রিকশা ডাকা হলো। রিকশায় সুলতান, ঈসা, রিয়ান আর একজন অচেনা ছাত্র ভাই। আমার চোখে তখনই ধূসর ছায়া পড়তে শুরু হলো। চোখের পাতাগুলো ভারি নিস্তেজ হতে লাগল। মনে হলো নিশ্চিত প্রাণ যাবে এবার। রিয়েল বুলেট পেটে ঢুকেছে এটা ভাবতেই তো গা শিউরে ওঠে। তাও আবার আমার মতো মানুষের পেটে। সামান্য অভিনেতা হবার স্বপ্নই ছিল যার জীবনের সবকিছু। কবিতা লিখে আত্মার প্রশান্তি আনাই ছিল যার ছাত্রজীবনের সব থেকে বড়ো অর্জন– তাকে কি না আজ এভাবে মরতে হচ্ছে; তাও আবার পুলিশের গুলিতে। ফ্যাসিস্ট ক্ষমতায় থাকলে হয়ত আমি মরে গেলেও সব প্রজন্মের কাছে আমাকে দেশদ্রোহী প্রমাণ করাতো।

আমার ভাবতেই কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল। গুলি পেটে অথচ ব্যথা পেটের থেকে বুকে বেশি হচ্ছিল ঘৃণার বিচরণ। রিকশায় করে নিয়ে যাবার সময় সুলতান খুবই উত্তেজিত স্বরে সবাইকে ডেকে বলছিল 'চায়া থাকেন মিয়া! এদিকে সব মরতাসে বুলেট খায়া আর আপনারা সেক্টরের মধ্যে লুকায় আছেন? রিয়াল বুলেট মারছে রিয়াল বুলেট।'

আমি মরে গেলে কার কী ক্ষতি হবে? বাবা-মা'র শুধু। তাছাড়া আর কোনো পিছুটান দেখছি না। মৃত্যু সুনিশ্চিত মনে হচ্ছে তাই আফসোস করছি না। আমার মৃত্যুতে মানুষের ক্ষতি হবে বলে মনে হচ্ছে না। যা একটু ফিন্যান্সিয়াল চাপ থাকবে বাবার কাঁধে। তবে এই মৃত্যু অভিশাপ নয়, এ আশীর্বাদ। আমি যদি সারাজীবন আমার পরিবার নিয়েই ভাবি তাহলে মৃত্যুর পর শুধু আমার পরিবারের মানুষের ক্ষতি হবে, তারাই কাঁদবে। কিন্তু আমি যদি সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ে ভাবতে পারি, তাহলে হয়ত আমার মৃত্যুতে পারিবারিক সম্পর্কের বাইরেও অনেক মানুষের হৃদয়ে আঘাত হানবে। এই মৃত্যু আসলে মানবজাতির কতটা উপকারে আসবে তা জানি না, তবে আমাদের বিজয় হলে ভবিষ্যতে কোনো এক মেধাবী তরুণ/তরুণী একটা চাকরিতে তার সর্বোচ্চ মেধার শক্তি প্রয়োগ করে সফলতা অর্জনের মাধ্যমে পরিবার, দেশ ও জনস্বার্থে কাজ করতে পারবে।

চোখের সামনেই আন্দোলন কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছিল– তা কেউই ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি। জুলাইয়ের ১ তারিখ থেকে শুরু হয় প্রথমে 'এক দফা' কোটা সংস্কার আন্দোলন। এই এক দফা চলতে থাকে ১৮-১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রায়। পুলিশ-র‍্যাবের গণহত্যার কারণে দফা পালটে আরও দফায় ভাগ হয়। তারপর আর্মি, বিজিবি মোতায়েন করে গণহত্যা আরও বাড়ানো হয়। তারপর ২০ তারিখ থেকেই কারফিউ।

আমি মনে করি, যদি আমার জন্ম এ পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণ উপকারে আসে তবে আমার জন্ম সার্থক। আর যদি আমার মৃত্যু এ পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণ উপকারে আসে তবে আমার মৃত্যু সার্থক। মৃত্যু নয়, জন্মকে ভয় করি।

১৮ই জুলাই উত্তরা আজমপুরে আমার পেটে গুলি লাগার পর, সবাই তড়িঘড়ি করে যখন হাসপাতালে নিয়ে রওনা হচ্ছিল; ঠিক তখন সহযোদ্ধা সুলতান একটি ভিডিও বানায়। কে জানত, আমি বেঁচে থাকব!!

সুলতানও হয়ত এই ভেবে শেষবারের মতো আমার ১২ সেকেন্ডের একটা ভিডিও বানিয়ে আমাকে ক্যামেরাবন্দি করে নেয়। ঐ সময় দীর্ঘ ভিডিও কিংবা ছবি তোলার পরিস্থিতি ছিল না। তবুও যা তুলেছে সে-ই অনেক। ভিডিওটা যতবারই দেখি আমার পেটে ততবারই গুলির সেই ঝুন... ভাইব্রেশনের অনুভূতি হয়।

ফেইট আমাকে যেখানই নিয়ে যাক, আমি মনে করি এটাই আমার জন্য সর্বোত্তম। ছোটোবেলা থেকেই একাডেমিক পড়াশোনায় দুর্বল থাকার কারণে বাবা-মা'কে কেউ কখনো প্রশংসা করেনি। কিন্তু দেশের জন্য এত বড়ো ত্যাগ স্বীকার করতে পেরেছি বলে এখন মানুষ তাদের 'জুলাই যোদ্ধার বাবা-মা' কিংবা 'দেশপ্রেমিক অনিকের বাবা-মা' বলে ডাকে। আব্বু-আম্মুও এটা গর্বের সাথে ওউন করে। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে গর্বের বিষয়।

জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণের পর থেকে সিনেমার ক্যারিয়ারে খুব বেশি মনোযোগ দিতে পারছি না। না চাইলেও রাজনৈতিক বিষয়ে যুক্ত হতে হচ্ছে। জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি অনেক গুণ বেড়ে গেছে। শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং ওজন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি তো রয়েছেই, যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে।

ফিলোসফিতে আমার পছন্দের একটা শব্দ হচ্ছে 'আমোর ফাতি' (Love of Fate)। অর্থাৎ ভাগ্য বা নিয়তিকে ভালোবেসে আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে সর্বোত্তম বলে মেনে নিচ্ছি। তাই আমি খুবই শান্তিতে ও সুখে আছি।

নাটক ও সিনেমায় অভিনয় করা আমার স্বপ্ন। এই একটিমাত্র ক্যারিয়ার বেছে নিয়েছি। পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা ও কবিতা লিখে জীবন পার করার ইচ্ছে আছে। প্রয়োজনে রাজনৈতিক আন্দোলনেও সক্রিয় থাকব।

আমি সাম্য ও মানবতার বাংলাদেশ চাই। একই সঙ্গে দেশের সরকার ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার পথ খুঁজে বের করতে হবে। সঠিক প্রয়াস ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দেশকে দুর্নীতির কবল থেকে মুক্ত করে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমাদের এতটা পিছিয়ে থাকার কথা নয়। বিগত ১৭ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনই আমাদের দমিয়ে রাখার মূল কারণ।

নাইমুল ইসলাম খান অনিক: উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি বিষয়ে তৃতীয়বর্ষে অধ্যয়নরত

ডায়াবেটিস রোগীদের মুখের স্বাস্থ্য সমস্যা

অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী

অনেকেই জানেন না যে, অনেক ক্ষেত্রে একজন ডেন্টিস্টই প্রথম একজন ডায়াবেটিক রোগীকে শনাক্ত বা চিহ্নিত করতে পারেন এবং তাকে একজন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে রেফার করতে পারেন। সম্প্রতি ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে 'ওপেন ডায়াবেটিস রিসার্চ অ্যান্ড কেয়ারে' প্রকাশিত প্রবন্ধে এ বিষয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, প্রতি ৫ জন মাড়ির রোগ আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ১ জনের টাইপ-২ ডায়াবেটিস থাকতে পারে এবং তারা এ বিষয়ে অবগত নন।

ডায়াবেটিস এবং মুখের স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে যোগসূত্র হলো রক্তে উচ্চ মাত্রায় শর্করা। যদি রক্তে শর্করা ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ না হয় তবে মুখের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো তীব্রতর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এর কারণ হলো অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস শ্বেত রক্তকণিকাকে দুর্বল করে দেয়, যা মুখের যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া আছে তার সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারে না।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ডায়াবেটিসের কারণে প্রধান অঙ্গ জটিলতার ঝুঁকি কমানো যায়– যেমন চোখ, হার্ট এবং স্নায়ুর ক্ষতি– তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখলে মুখের স্বাস্থ্য সমস্যার জটিলতা থেকে রক্ষা করতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকলে প্রধান প্রধান জটিলতাগুলো প্রতিরোধ করা যায়। যেমন– চোখের ছানি পড়া, হৃদরোগের সমস্যা, বিভিন্ন নিউরো বা স্নায়ুরোগ সমস্যা, কিডনি সমস্যা ও মাড়ির রোগ বা Periodontal disease (ডায়াবেটিসের ষষ্ঠ জটিলতা) ইত্যাদি।

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস মুখের ভেতরের লালা (থুথু) প্রবাহ হ্রাস করতে পারে, ফলে মুখ শুকিয়ে গিয়ে শুষ্ক মুখে আরও ঘা, আলসার, সংক্রমণ এবং দাঁতের ক্ষয় বৃদ্ধি করতে পারে।

শ্বেত রক্তকণিকা দুর্বল করার পাশাপাশি, ডায়াবেটিসের আরেকটি জটিলতা হলো এটি রক্তনালীগুলোকে চিকন করে তোলে। এটি মুখসহ শরীরের টিস্যু থেকে পুষ্টির প্রবাহ এবং বর্জ্য পদার্থের প্রবাহকে ধীর করে দেয়। শরীর সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা আরও ঘন ঘন এবং আরও গুরুতর মাড়ির রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ওরাল সার্জারি বা অন্যান্য দাঁতের সার্জারির পরে দ্রুত নিরাময় হন না, কারণ চিকিৎসার জায়গায় রক্ত প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত বা কম হতে পারে।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যারা প্রায়শই বিভিন্ন সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করেন তাদের বিশেষ করে মুখ এবং জিহ্বার ছত্রাক (Oral Candidiasis) সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের লালায় উচ্চ গ্লুকোজের কারণে ছত্রাক বৃদ্ধি পায়। ডেনচার পরা (বিশেষত যখন ক্রমাগত পরা হয় বা নকল দাঁতের ব্যবহারকারীদের ছত্রাক সংক্রমণ বেশি হতে পারে। মুখ গহ্বর এবং জিহ্বায় ক্ষত বা ঘা– এই অবস্থাটি থ্রাশের উপস্থিতির কারণে হয়।

তামাক ও ধূমপানের সঙ্গে ডায়াবেটিসের সম্পর্ক ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। ধূমপায়ী ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা আরও বেশি ঝুঁকিতে থাকেন– অধূমপায়ীদের তুলনায় থ্রাশ এবং পেরিওডন্টাল রোগ বা মাড়ির রোগ হওয়ার সম্ভাবনা ২০ গুণ বেশি। ধূমপান, জর্দ্দা, গুল ও সাদাপাতা ব্যবহার করলে মুখের

ঘা ও সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়। ধূমপান ও তামাক সেবন ডায়াবেটিসের ভয়াবহতা, মুখের সমস্যা এবং জটিলতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা তরুণ বয়সে ধূমপান শুরু করে তারা পরবর্তীতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারে। ডায়াবেটিস আছে এমন কেউ যদি ধূমপান, তামাক সেবন করে তবে তাদেরও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। ফলে তাদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক ও পায়ের পচনশীল রোগ 'গ্যাংগ্রিন' হওয়ার আশঙ্কা ৫ গুণ বেশি।

ডেন্টিস্ট বা পিরিয়ডন্টিস্টের সাথে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং চিকিৎসা সম্পর্কে পরীক্ষা করানোর আগে ও পরে একজন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলা প্রয়োজন।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ডেন্টাল চিকিৎসা নিরাময়ে বেশি সময় লাগতে পারে। তাই, ডেন্টাল সার্জনের চিকিৎসা পরবর্তী নির্দেশাবলি খুব সচেতনভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন। কোনো কৃত্রিম দাঁতের জন্য বা ধারালো দাঁতের কারণে ঘর্ষণ লেগে জিহ্বা বা মুখ কাটলে অবিলম্বে ডেন্টিস্টকে দেখিয়ে চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজন। কারণ সেই ঘা বা ক্ষত পরবর্তীতে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের লালায় উচ্চ গ্লুকোজের মাত্রা ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এটি ক্যারিজ (দাঁতের ক্ষয় বা গর্ত) এবং মাড়ির রোগ বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়। এছাড়াও, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সারাদিনে বেশি ও ঘন ঘন খাবার খেতে থাকে। এই কারণেও ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির ফলে ক্যারিজ বা দাঁতের ক্ষয় হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দাঁত নষ্ট হওয়ার পেছনে যা রয়েছে। প্রথমত, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা জিনজিভাইটিস এবং পেরিওডন্টাল রোগের বৃদ্ধির জন্য প্রধান কারণ হতে পারেন। যদি সংক্রমণ অব্যাহত থাকে, তাহলে এটি দাঁতের পার্শ্ববর্তী অন্তর্নিহিত হাড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ হলো যে, ভালো ওরাল হাইজিন অভ্যাস বা মুখের যত্নের অনুশীলন করার মাধ্যমে যেমন প্রতিদিন অন্তত দুবার (অথবা প্রতি খাবারের পরে) ফ্লোরাইডযুক্ত টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করা, প্রতিদিন ফ্লস করা এবং রক্তে শর্করার মাত্রা ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে সংক্রমণের আশঙ্কা অনেকাংশে কমে আসে এবং তাতে পেরিওডন্টাল রোগ অনেক কমে যায় বা দূর হয়, এবং দাঁতের অন্যান্য ক্ষতির ঝুঁকিও কম হয়।

মুখের স্বাস্থ্যের যে-কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটলে অবিলম্বে ডেন্টাল সার্জনকে দিয়ে পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। মুখের স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধ বা কমানোর পরামর্শগুলোর মধ্যে রয়েছে– রক্তের সুগার যতটা সম্ভব স্বাভাবিকের কাছাকাছি রাখা। প্রতিটি ডেন্টাল ভিজিটে, ডেন্টিস্টকে ডায়াবেটিসের অবস্থা জানানো। বছরে অন্তত দুবার দাঁত এবং মাড়ি পরিষ্কার করা প্রয়োজন (Dental Scaling) এবং সেই সাথে ডেন্টিস্ট দ্বারা মুখ ও দাঁত পরীক্ষা করা। দিনে অন্তত একবার ডেন্টাল ফ্লস ব্যবহার করা প্রয়োজন তাতে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে প্লাক জমা হওয়া প্রতিরোধ করা যায়।

দিনে দুবার ব্রাশ করুন, সকালে নাস্তার পরে ও রাতে আহারের পরে ঘুমাতে যাবার আগে। আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন ফ্লোরাইড টুথপেস্ট দিয়ে দিনে দুবার দুই মিনিটের জন্য ব্রাশ করার পরামর্শ দিয়েছে। আপনার টুথব্রাশটি মাড়ির সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোণে রাখুন এবং আপনার দাঁতগুলোর বাইরের, ভেতরে এবং চিবানো পৃষ্ঠতল বরাবর ব্রাশটি আলতো করে সামনে পেছনে ব্রাশ করুন এবং সেইসাথে দাঁতের প্রতিটি পৃষ্ঠ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে ভুলবেন না। আর নরম ব্রিসল ব্যবহার করতে ভুলবেন না। গবেষণায় দেখা যায় যে, শক্ত ব্রিসলগুলো দাঁতের এনামেলকে ক্ষয় করে।

দিনে একবার ফ্লস করা প্রয়োজন। যদি তা না করা হয়, তবে দাঁতগুলোর মধ্যবর্তী স্থানগুলোতে ও মাড়ির রেখা বরাবর ফাঁকে ফাঁকে খাদ্য কণা জমা হয়, এই ফ্লস ব্যবহার দাঁতের ক্ষয় এবং মাড়ির রোগের জন্য একটি উত্তম প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ফ্লস করতে, আপনার মাঝের আঙুলের চারপাশে একটি ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ ফ্লস বা সুতা বের করুন, কাজ করার জন্য এক বা দুই ইঞ্চি রেখে দিন। আপনার থাম্ব এবং তর্জনীর মধ্যে ফ্লসটি ধরে রাখুন, প্রতিটি দাঁতের চারপাশে বাঁকা করুন এবং আলতো করে এটি দাঁতের উপরে এবং নীচে এবং মাড়ির ভেতরে প্রবেশ করান। ফ্লস ছাড়াও বাজারে যেগুলো আছে যেমন: ইন্টারডেন্টাল ডিভাইস ব্যবহার করে দেখতে পারেন। ডেন্টাল ফ্লস এমন জায়গায় পৌঁছানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা নিয়মিত টুথব্রাশ পারে না।

বছরে অন্তত দুবার দাঁতের ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। আপনার মাড়ির স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে প্রতি ৬ মাসে একবার পরিষ্কারের পরামর্শ দিতে পারেন। আপনার ডেন্টিস্ট একটি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল মুখ ধুয়ে ফেলা বা কুলি করার জন্য মাউথ ওয়াশ ব্যবহারের পরামর্শ দিতে পারেন। আপনার বর্তমান স্বাস্থ্য বা ওষুধের যে-কোনো পরিবর্তন সম্পর্কে আপনার ডেন্টিস্টকে জানাতে ভুলবেন না, কারণ উভয়ই আপনার মুখের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে– যেমন শুষ্ক মুখের লক্ষণ (Dry Mouth) বা ঘন ঘন মুখে সংক্রমণ বা ইনফেকশন অথবা মুখের ঘা। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ডায়াবেটিস সম্পর্কে অভিজ্ঞ এমন একজন ডেন্টিস্ট সন্ধান করা প্রয়োজন।

অধ্যাপক ডা. অরূপরতন চৌধুরী: একুশে পদকপ্রাপ্ত শব্দসৈনিক, প্রখ্যাত চিকিৎসক ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মানস–মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা

‘কবর’ কবিতার শতবর্ষ

ড. মোহাম্মদ আলী খান

কবিতার নাম ‘কবর’। কবির নাম জসীমউদ্‌দীন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *কল্লোল* পত্রিকার পেছনের পাতায় একটি ‘গ্রাম্যকবিতা’ নামে শ্রী জসীমউদ্‌দীনের এই কবিতাটি সেই ১৯২৫ সালে ছাপা হয়।

তারপরের ইতিহাস আলোয় আলোয় ভরা, সোনা দিয়ে মোড়া। ‘কবর’ কবিতা স্কুলের পাঠ্য হয়ে বাঙালি তরুণ-তরুণীর হৃদয়ে যেমন স্থান করে নিয়েছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যে পেয়েছে স্থায়ী আসন। কবিতার শব্দে ছন্দে ঝরে পড়ে বেদনার অশ্রুবিন্দু।

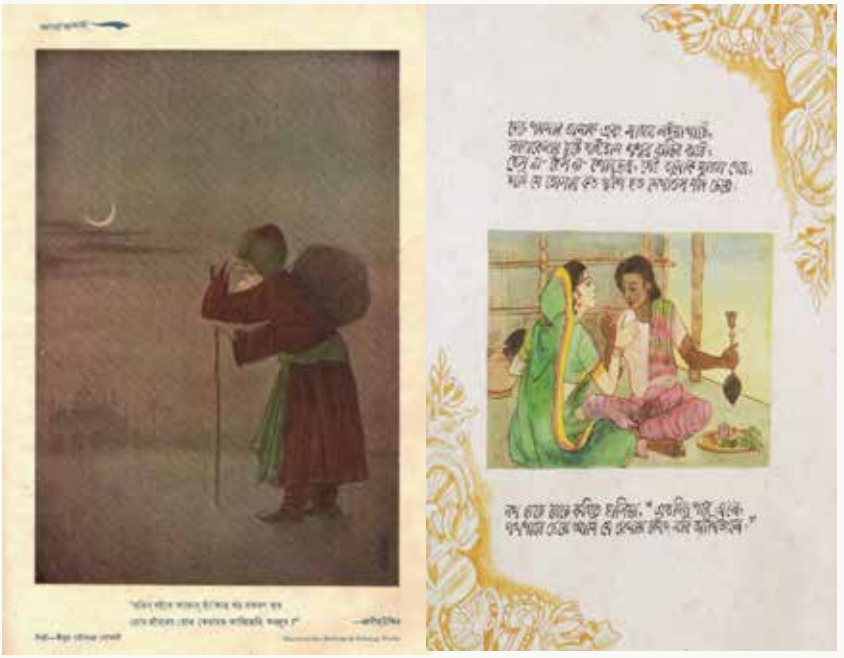

সেই কবিতা প্রকাশের শত বছর পার হলো এই ২০২৫ সালে। শতবর্ষ পরেও ‘কবর’ কবিতা আজো পাঠকের হৃদয়ে আলোড়ন তোলে, আবৃত্তিকারের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় তার মহিমা। একজন কবির কবিতা ১০০ বছর পরেও হয়ে ওঠে প্রিয় কবিতা, যাকে বারে বারে স্পর্শ করা যায় অন্তরের গহীন কোণে।

কবিতার শুরুটাই আবেগঘন:

‘এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।’

পুরো কবিতা জুড়ে সেই জলভরা আবেগ অটুট থেকেছে শেষ অবধি:

‘মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর!
জোড়হাতে দাদু মোনাজাত করি, “আয় খোদা! রহমান,
ভেস্ত নাজেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ!”

আধুনিক বাংলা সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখপত্র *কল্লোল* ১৯২৩ (বৈশাখ ১৩৩০) আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ ও সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ।

এই পত্রিকায় ‘কবর’ কবিতাটি ১৯২৫ সালে (তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) প্রথম প্রকাশিত হয়। এসময় সম্পাদক ছিলেন : শ্রী দীনেশরঞ্জন দাশ ও সহ-সম্পাদক ছিলেন শ্রী গোকুলচন্দ্র নাগ। কল্লোল পাবলিশিং হাউস, ২৭ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা থেকে *কল্লোল* পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা চারি আনা। বার্ষিক মাশুলসহ তিন টাকা আট আনা। প্রকাশের সময় হিসেবে; কবিতাটি এ বছর (২০২৫) শতবছর পূর্ণ করেছে।

সেই *কল্লোল* পত্রিকার মূল চিত্রানুলিপি নিম্নরূপ :

‘কবর’ কবিতাটি জসীমউদ্‌দীন রচনা করেছেন ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। কবিতার প্রতিটি চরণে তিনটি পূর্ণপর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব রয়েছে। পূর্ণপর্বের মাত্রা ৬ ও অপূর্ণপর্বের মাত্রা ২ মাত্রা বিন্যাস: ৬ + ৬ + ৬ + ২ = ২০ মাত্রা। এ কবিতার জনপ্রিয়তার একটি কারণ এর উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি। যেমন:

উপমা

ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে

উৎপ্রেক্ষা

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু সাত বছরের মেয়ে,
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।

সমাসোক্তি

জোড়া মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু-ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।

‘কবর’ কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর চরিত্রগুলো খুব চেনা, একান্ত আপন, তাই বারে বারে পড়তে ইচ্ছা করে।

‘কবর’ কবিতার প্রথম প্রকাশ নিয়ে কল্লোল যুগ গ্রন্থে যে আলোচনা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

‘কল্লোল-এর আষাঢ় ১৩৩২ সংখ্যায় এই সুবিখ্যাত কবিতাটি প্রকাশিত হয় কল্লোল যুগ-এ (পৃ. ১০৪) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন : “কবিতাটির নাম ‘কবর’। বাংলা কবিতার দিগদর্শন। কল্লোল-এর পৃষ্ঠা থেকে সেই কবিতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার বাংলা পাঠ-সংগ্রহে উদ্ধৃত হল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে অনভিজাত কল্লোল-এর নামটা বেমালুম চেপে গেল।”

একেবারে সাদামাটা আত্মভোলা ছেলে এই জসীমউদ্‌দীন। চুলে চিরুনি নেই, জামায় বোতাম নেই, বেশবাসে বিন্যাস নেই। হয়ত বা অভাবের চেয়েও ঔদাসীন্যই বেশি। সরলশ্যামলের প্রতিমূর্তি যে গ্রাম তারই পরিবেশ তার ব্যক্তিত্বে তার উপস্থিতিতে। কবিতায় জসীমউদ্‌দীনই প্রথম গ্রামের দিকে সংকেত, তার চাষা-ভুসো, তার খেতখামার, তার নদী-নালার দিকে। তার অসাধারণ সাধারণতার দিকে। যে দুঃখ সর্বহারা হয়েও সর্বময় যে দৃশ্য অপজাত হয়েও উঁচু জাতের। কোনো কারুকলার কৃত্রিমতা নেই, নেই কোনো প্রসাধনের পারিপাট্য। একেবারে সোজাসুজি মর্মস্পর্শ করবার আকুলতা। কোনো ‘ইজমে’র ছাঁচে ঢালাই করা নয় বলে তার কবিতা হয়ত জনতোষিণী নয়, কিন্তু মনোতোষিণী।

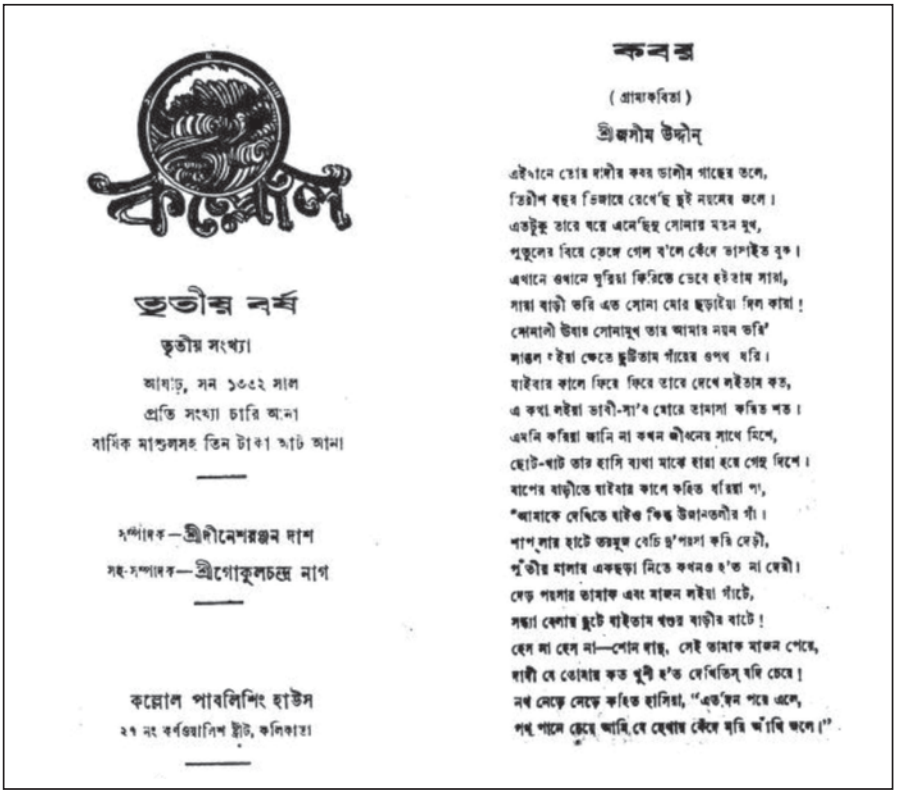

এমনি একটি কবিতা গে’য়ো মাঠের সজল শীতল বাতাসে উড়ে আসে কল্লোল-এ।’

আর কবির নিজের কথায়:

ফরিদপুর শহরে বেড়াইতে গিয়াছি। কলেজের একজন অধ্যাপক আমাকে বলিলেন, “এবার তুমি প্রসিদ্ধ হয়ে গেলে। আজকে তিলক-সংখ্যা ফরওয়ার্ড কাগজ পড়ে দেখ, দীনেশবাবু তোমাকে কি ভাবে প্রশংসা করেছেন।” ‘ফরওয়ার্ড’ খুলিয়া দেখিলাম নাম দিয়া দীনেশবাবু আমার উপরে এক প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

সেই প্রবন্ধে প্রথমে তিনি নজরুল ইসলামের নাম করিয়াছেন। তার পরেই আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

কল্লোল

তৃতীয় বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

আষাঢ়, সন ১৩৩২ সাল

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

বার্ষিক মাশুলসহ তিন টাকা আট আনা

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

সহ-সম্পাদক—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবর

(গ্রাম্যকবিতা)

শ্রীজসীম উদ্দীন্

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল ব’লে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ী ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
সোনালী উষার সোনামুখ তার আমার নয়ন ভরি’
লাঙল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ওপথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত,
এ কথা লইয়া ভাবী-সা’ব মোরে তামাসা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে,
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
বাপের বাড়ীতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা,
“আমাকে দেখিতে যাইও কিন্তু উজানতলীর গাঁ।
শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু’পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হ’ত না দেরী।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুর বাড়ীর বাটে!
হেস না হেস না—শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদী যে তোমার কত খুশী হ’ত দেখিতিস্ যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, “এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখি জলে।”

কল্লোল-এ প্রকাশিত আমার সেই ‘কবর’ কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া তার অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। এই প্রবন্ধ বাহির হওয়ার পর বাংলা দেশের বহু বড়ো বড়ো মাসিক পত্র হইতে আমি কবিতা পাঠাইবার আমন্ত্রণ পাইতে লাগিলাম। ইহার পর নিজের কবিতা ছাপাইতে আর আমাকে বেগ পাইতে হয় নাই।

যখন আমি বি. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন দীনেশবাবু আমাকে লিখিলেন, “তোমার সেই ‘কবর’ কবিতাটি নকল করে পাঠাও। আমি ‘ম্যাট্রিক সিলেকশনে’ জুড়ে দেব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ক্লাসের ছাত্রেরা পড়বে।” ইহার কিছুদিন পরে দীনেশবাবু লিখিলেন, “তোমার কবিতা ম্যাট্রিক ক্লাসে পাঠ্য হয়েছে। তোমার ছাত্রাবস্থায়ই তোমার কবিতার আদর হলো, বাংলা দেশের আর কোনো সাহিত্যিকের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই।”

পল্লিকবিকে দেখার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফরিদপুরের একজন লেখক-গবেষক এম এ খান আজাদ-এর (বর্তমান বয়স ৬৭ বছর) স্মৃতিচারণ উল্লেখ করে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি:

‘অনেক কবির কবিতা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি কিন্তু সে কবিদের কোনো দেখা মেলেনি। সে-সময় বিখ্যাত কবিদের মধ্যে পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনই একমাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁকে দেখার অনেক স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই আমার সমবয়সি একজন বন্ধুকে নিয়ে দু’জনে

একটি সাইকেলে করে পল্লিকবির বাড়িতে উপস্থিত হলাম। কুমার নদীর পাড়ে বাড়ির সামনে একটি কবর নজরে পড়ল। কবরে কোনো সাইনবোর্ড চোখে পড়েনি। কবরের উপর ডালিমগাছ দেখে বুঝলাম কবরটি সেই বিখ্যাত কবিতা 'কবর'– এর কবির মায়ের কবর। কবির বাড়িতে কয়েকটি টিনের ঘর নজরে পড়ল। অতি সাধারণ ঘরগুলোতেই ছিল কবির বসবাস। কবিকে দেখার জন্য ঘরের সামনে উঁকি দিয়ে জানলাম কবি বাড়িতে নেই। মনের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে ফিরে এসে প্রথমে দেখলাম তাঁর বাড়ির অদূরে হিন্দুদের মৃতদেহ সৎকার করার স্থান অম্বিকাপুর শ্মশানঘাট। ওখান থেকে ফিরে গেলাম সেই বিখ্যাত সোজন বাদিয়ার ঘাটে। ঘাটটি ছিল একেবারে অতি সাধারণ। কয়েকটি তাল বা খেজুর গাছের গুঁড়ি ফেলে ঐ ঘাটটি ছিল। বেদে বা ভ্রমণ করার নৌকা সবসময় ঘাটে বাঁধা থাকতো। কৌতূহল হলো ১৯৭১ সালে যুদ্ধের শেষ দিকে অম্বিকাপুর রেল স্টেশনের নিকট ভারতীয় বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমা বিস্ফোরণের স্থান দেখার। দেখলাম লক্ষভ্রষ্ট হয়ে রেললাইনের নিকট একটু ফাঁকা জায়গায় বোমা ফেলে বড়ো গর্ত সৃষ্টি হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন লোক হতাহত হয়েছেন। এর বিকট শব্দ আমাদের বাড়ি থেকে শোনা গিয়েছিল।

এর কয়েক দিন পরে ফরিদপুর টাউন থিয়েটারের উদ্যোগে অরোরা টকিজ সিনেমা হলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। কবিকে খুব কাছ থেকে দেখার ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল। ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যে ফরিদপুর স্টেডিয়ামে চলছিল শিল্পমেলা। মেলায় চলতো সার্কাস, মোটর সাইকেল জাম্প, মোটর সাইকেল কাঠের গোলচক্করে চালনা, ফায়ার জাম্প, হাউজি, ইলেকট্রিক চেয়ার, জাদুর খেলা, পুতুলনাচ ইত্যাদি। পুতুলনাচ দেখার জন্য স্টেডিয়ামের পূর্বপ্রান্তে বড়ো একটি পুকুরের পারে কবি উপস্থিত হলেন। সেখানে তালাই বা মাদুর বিছানো থাকত; দর্শকরা মাটিতে তার উপরে বসে পুতুলনাচ উপভোগ করত। কিন্তু কবি এসেছেন– তাঁর জন্য একটি হাতলওয়ালা চেয়ারের ব্যবস্থা করে ঠিক নাচের মঞ্চের কাছে কবিকে বসানো হয়। কবি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আধাঘণ্টার এই পুতুলনাচ উপভোগ করলেন। কিন্তু আমার মন তখনো ভরলো না; কবিকে আরো কাছে থেকে দেখতে চাই।

আমরা স্কুল থেকে পাঁচজন বন্ধু মিলে অনাথের মোড়ের নিকট ডাকবাংলার পাশে কবির শহরের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে দেখার জন্য উপস্থিত হলাম। আমরা অনুরোধ করলাম একটি কবিতা লিখে দেওয়ার জন্য। কবি আমাদের সকলের নাম জিজ্ঞেস করলেন; তারপর একটি এ-ফোর সাইজের কাগজ নিয়ে তিনি আমাদের পাঁচজনের নামে দশ-বারো লাইনের একটি কবিতা লিখে ফেললেন। কবির নিজ হাতে আমাদের নামে কবিতা লিখলে আমরা ধন্য হলাম। পরদিন সে কবিতা স্কুলের ক্লাসে স্যারকে দেখালে স্যার কবিতাটি ক্লাসে পড়ে শোনান। জানি না কবিতাটি কার কাছে সংরক্ষিত আছে কিংবা নেই, এখনো (২০২৫) সেই স্মৃতি মাঝেমধ্যে আমাকে অনুরণিত করে।'

ড. মোহাম্মদ আলী খান: সচিব (অবসরপ্রাপ্ত), লেখক ও গবেষক, khanma1234@gmail.com

ডেটা ক্লাসিফিকেশন থাকছে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনে

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেছেন, বিশ্বে প্রথমবারের মতো ডেটা ক্লাসিফিকেশনকে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ২৮শে জুন ঢাকায় প্রেস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ-এর সেমিনার কক্ষে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সাম্প্রতিক অপতথ্যের গতি-প্রকৃতি শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিশেষ সহকারী এ কথা বলেন।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ডেটার যে অংশ ব্যক্তিকে শনাক্ত করে সে অংশ ক্লাসিফাই করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন ইনফরমেশন (পিআইআই)– এর জন্য দেশেই আলাদা স্টোরেজ করা যেন এটা দেশের বাইরে না যায়। এর মধ্যে কনফিডেনশিয়াল তথ্য, যেমন হেলথ রেকর্ডস বা ফিন্যান্সিয়াল ডেটা, ব্যবহার করা যাবে নির্ধারিত শর্তে এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ডেটার যে অংশে ছবি, ভিডিও, কথা থাকবে তা একটা ম্যাপিং এর মাধ্যমে যে-কোনো জায়গায় স্টোর করা যাবে কিন্তু পিআইআই-এর স্টোরেজ দেশেই রাখতে হবে। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে উৎপাদিত, প্রস্তুতকৃত সকল কন্টেন্টকে সাইবার স্পেসের সীমানায় এনে অপরাধের আওতায় আনা হয়েছে বলেও বিশেষ সহকারী মন্তব্য করেন।

পিআইবি'র পরিচালক ফারুক ওয়াসিফের সভাপতিত্বে সেমিনারে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (ইবিএলআইসিটি) প্রকল্পের পরামর্শক মামুন অর রশিদ।

প্রতিবেদন: আনিকা তাবাস্‌সুম

বর্ষার রূপ

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

রূপবৈচিত্র্যের লীলাভূমি ও ঋতুচক্রের দেশ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। ষড়ঋতুর বিচিত্র রূপের ছটায় আমরা আন্দোলিত হই বছরজুড়েই। নানান সময় নানান রংঢং ছড়িয়ে নানান ঋতু এসে হাজির হয় বাংলার দ্বারে দ্বারে। বিভিন্ন ঋতুর আগমনে এখানে অতুলনীয় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সমারোহ ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় অপরূপা বাংলাদেশের ষড়ঋতুচক্রে বর্ষার স্থান দ্বিতীয়। বাংলা দিনপঞ্জিকা অনুসারে আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল। কিন্তু আমাদের দেশে বর্ষার আগমন সাধারণত বৈশাখ মাসেই ঘটে থাকে আর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের কারণে এর ব্যাপ্তি আশ্বিন মাসের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আমাদের জীবনযাত্রার পথে বর্ষার স্নিগ্ধ পরশ প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। বর্ষার রূপ-রস আর সৌন্দর্যে প্রকৃতি সজীব হয়ে ওঠে। বৃষ্টি ধোয়া প্রকৃতির রূপে মন মেতে ওঠে। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ যেন হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায়।

গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহ আর প্রখর রোদে জনজীবন যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখন বর্ষা আমাদের দরজায় কড়া নাড়ে। ঠিক সে সময়ই প্রকৃতিকে শীতল, সতেজ, স্নিগ্ধ, মনোরম আর উজ্জ্বল করতে ঘন গৌরবে নবযৌবনে আগমন ঘটে বর্ষা ঋতুর। মরা নদীও বর্ষায় জেগে ওঠে তার রূপ-যৌবন জানান দিতে চায়। বাংলাদেশ যে নদীমাতৃক দেশ এটা পূর্ণতা পায় বর্ষাকালে। সত্যিই বর্ষা আমাদের মনের কথা, হৃদয়ের ভাবাবেগ বুঝতে পারে। তাইতো বর্ষায় বৃষ্টি তার রিনিঝিনি নূপুর পায়ে ঝুমুর ঝুমুর তালে অহর্নিশ ঝরে পড়ে বাংলার উর্বরা ভূমিতে।

বর্ষাকে প্রকৃতির রানি বলা হয়। শিল্পরসিক মন বর্ষার বিচিত্রতায় অভিভূত হয়ে যায়। এক কথায় প্রকৃতিকে মন ভরে উপভোগ করতে অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে হাজির হয় বর্ষা। বর্ষায় গ্রামবাংলার প্রকৃতি যেন তার রূপ-যৌবনে ভরা আসল সৌন্দর্য ফিরে পায়। বর্ষার আগমনে প্রকৃতিতে দেখা মেলে সবুজের সমারোহ, যে দিকে চোখ যায় সেদিকেই সবুজ বৃক্ষ হাতছানি দিতে থাকে। বর্ষার কোমলতা মানুষের হৃদয়টাকে যতটা ছুঁয়ে যায় বাংলার আর কোনো ঋতু এভাবে ছুঁতে পারে না। তাই বর্ষা বাংলার অনন্য ঋতু। বৃষ্টি যেমন প্রকৃতিকে স্নিগ্ধ, নির্মল, সতেজ আর উজ্জ্বল করে তেমনি মানুষের মনকেও ধুয়ে-মুছে করে তোলে পবিত্র। কৃষকেরা বৃষ্টিতে ভিজে ফসল তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে। কারণ বর্ষাকাল পাট কাটার ও ধান চাষের উপযুক্ত সময়।

বর্ষা মানে বাহারি রঙের সুগন্ধি ফুলের সমাহার। বর্ষা ঋতু যেন ফুলের জননী। বর্ষা যেন মনে বিলিয়ে দেয় ফুলের সমারোহ এবং এর সৌন্দর্য আমাদের করে তোলে বিমোহিত। আবহমানকাল ধরেই আমাদের প্রকৃতিকে বর্ষার ফুল স্বতন্ত্র সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়ে আসছে অনুপম উদারতায় এবং বৃষ্টিস্নাত বর্ষার ফুলের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের মন রাঙিয়ে আসছে অনন্তকাল ধরে। বর্ষা ও তার ফুল যেন বাংলার প্রকৃতির আত্মা। কদম ফুলের আগমনই বলে দেয় এই বুঝি বর্ষাকাল এসে হাজির হলো প্রকৃতির মাঝে। কদম ফুলের শোভাবর্ধন যেন প্রকৃতিকে বৈচিত্র্য এনে দেয়। বর্ষার গাঢ় সবুজের সাথে চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শাপলা, কদম, কেয়া, তমাল, হিজল, জারুল, করবী, সোনালু, বকুল, গন্ধরাজ, হাসনাহেনা, রঙ্গন, অলকানন্দ, কলাবতী, চন্দ্রপ্রভা, কামিনী, কলমি ফুল, পদ্ম, বনতুলসি, দোলনচাঁপা, ঝিঙেফুল, সোনাপাতি, কচুফুল, হেলেঞ্চা ফুল, উলটকম্বল, ঘাসফুল, শিয়ালকাঁটা, কেন্দার, কুমড়ো ফুল এবং নানা রঙের অর্কিডসহ বাহারি অনেক ফুল।

বর্ষাকে ভালোবাসার ঋতু বললেও অত্যুক্তি হবে না। বর্ষা ছাড়া প্রকৃতি যেন পূর্ণতা পায় না। বলা যায়, বর্ষা প্রকৃতি-পরিবেশ ও সৌন্দর্য একই সরলরেখায় গাঁথা। বর্ষার মন মাতানো নৃত্য-ছন্দ মানব মনে এক রহস্যময় আবেগ সৃষ্টি করে। বর্ষার অনুপম ছোঁয়ায় আমাদের চারপাশ ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে-তকতকে হয়ে যায়। প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় বর্ষা।

বর্ষার রূপ গ্রামবাংলার মানুষের কাছে নতুন রূপে ধরা দেয়। গ্রামের কাদাময় পথঘাটে, কৃষকের ক্ষেতে কিংবা মাঠে গ্রামের শিশু-কিশোররা কাদা মেখে ফুটবল খেলায় মেতে ওঠে। পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি করে বৃষ্টি উপভোগ করে।

বর্ষায় আকাশভাঙা বারিধারায় কানায় কানায় ভরে ওঠে নদনদী, পুকুর-নালা, হাওর বাঁওড়সহ ছোটো-বড়ো জলাশয়। মনের সুখে ডাকে ব্যাঙ। বৌ-ঝিরা এসময় ঘরে বসে নকশিকাঁথা সেলাই করে। সুঁচ আর হাতের জাদুতে হেসে ওঠে সুন্দর সুন্দর নকশিকাঁথা। বর্ষার মাঠে সবুজ ধানের শিষগুলো দুলতে থাকে আর বর্ষার রূপ কীর্তন গাইতে থাকে। খাল-বিল-পুকুরে ঝাঁকবেঁধে নানা প্রজাতির মাছের আনাগোনা চোখে পড়ে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা ডোবা-নালায় শালুক কুড়িয়ে বেড়ায়।

বর্ষায় বৃক্ষপ্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে। বর্ষাকাল বৃক্ষরোপণ করার উপযুক্ত সময়। জলবায়ুর বিরূপ পরিবর্তনের এই সময়ে বৃক্ষসম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

বর্ষাই তো বাংলার চিরায়ত রূপ। রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি ধারায় একসময় ক্ষেত-খামার, পথ-প্রান্তর ডুবে যায়। থই থই পানি চারদিকে। যেন নতুন সমুদ্র জেগেছে গ্রামজুড়ে। সবুজ সজীবতায় গাছপালা, বন-বনানী প্রাণ ফিরে পায়। কলার ভেলায় চড়ে আনন্দে মেতে ওঠে দুরন্ত কিশোরের দল। খালবিল, পুকুর পাড়ের গাছে চড়ে ঝাঁপ দেয় পানিতে, ডুব সাঁতারে হার মানায় পানকৌড়িকেও। কেউ কেউ আবার সুউচ্চ ব্রিজ-কালভার্টের উপর থেকেও লাফ দেয় পানিতে। ঘরের দাওয়ায় বসে বৃষ্টি পড়া দেখতে বেশ ভালোই লাগে।

বাঙালির অতি প্রিয় ঋতু বর্ষাকাল। বর্ষায় প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য আর আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো মেঘের ভেলা মন কেড়ে নেয়। অবারিত মাঠ, মেঘলা আকাশ, টলমলে জলের পুকুর, মাটির সোঁদা গন্ধ, ভেজা সবুজ ঘাস আর পাতার হাসি দেখতে ভালো লাগে। বর্ষার টইটম্বুর জলে টেংরা, পুঁটি, খলসে, টাকি, কৈ, শিং, মাগুর, শোল, বোয়াল, রুই, কাতলা, মৃগেলসহ নানা প্রজাতির মাছের সমারোহ দেখা যায়।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে বর্ষা তথা শ্রাবণ মাসের রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য ধানের অধিকাংশ প্রজাতি যেমন– আউশ, আমন, ইরি ধান এসময় রোপণ করা হয়। এসব ধানের চারা রোপণে উপযোগী প্রয়োজনীয় সেচ বা পানির চাহিদা মেটায় বৃষ্টির পানি। এতে কৃষকের সেচ ব্যয় বহুলাংশে কমে যায়। বর্ষাকালে নদীনালা, খালবিল ইত্যাদির পানি অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এতে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ও বিচরণ ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায় এবং ফলন বাড়ে। মাছের ফলন বৃদ্ধি পেলে গ্রামীণ মৎস্যজীবী তথা চাষিরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়।

বৃষ্টির দিনে গ্রামের কাঁচা রাস্তাঘাট হয়ে পড়ে কর্দমাক্ত। লোকজন হাঁটু সমান কাদা ভেঙে এবাড়ি-ওবাড়ি বেড়াতে যান। এমন দিনে কত আর গৃহকোণে বন্দি থাকা যায়। প্রতিবেশী সহপাঠীদের বাড়িতে গিয়ে পুতুল, লুডু এবং ক্লাব, দোকানপাটের সামনে বিশেষ করে কাছারিঘরে ক্যারাম-মার্বেল ইত্যাদি খেলায় মজে শিশু-কিশোররা।

কৃষিপ্রধান বাংলার প্রয়োজনের ঋতু বর্ষাকাল। বর্ষাকাল বাংলার পরম আকাঙ্ক্ষিত ঋতু হলেও প্রতিবছর কোথাও কোথাও জনজীবনে নিয়ে আসে দুর্ভোগ আর বিপর্যয়। নবযৌবনা সুন্দরী বর্ষাও সময় বিশেষে হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর। অতিবর্ষণের কারণে নদীমাতৃক বাংলার পলি জমে থাকা নদীগুলোর পানি ফুলেফেঁপে ওঠে।

বর্ষার প্রকৃতিতে মহান স্রষ্টার অপরূপ সৌন্দর্যের ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা প্রকৃতিকে যেমন সতেজ ও গতিময় করে তোলে, তেমনি মানুষের মনকে করে তোলে সহজসরল ও ছন্দময়। সৃষ্টিশীল চেতনাকে করে সুচারু ও তীক্ষ্ণ। বর্ষার প্রকৃতি ফুরফুরে অনুভূতি জাগায় অন্তরে। উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ তাড়িত করে সকলকে। বর্ষার প্রকৃতি উদার, প্রেম ও ভালোবাসার সরল অনুভূতি জাগ্রত করে।

কৃষিপ্রধান বাঙালি জনগোষ্ঠীর জীবনে বর্ষা মহান সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে আসে। বর্ষা অপূর্ব রূপশ্রী নিয়ে আগমন করে বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধির বুনিয়াদ গড়ে তোলে। একদিকে বর্ষার কল্যাণময়ী রূপ, অন্যদিকে তার ভয়ংকর প্লাবনচিত্র। তবুও সব মিলিয়ে বর্ষা বাংলার রূপ মাধুর্যকে যতখানি বৈচিত্র্যময় করে তোলে ঠিক তেমনটি আর কোনো ঋতুতে দেখা যায় না।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর, dr.alim1978@gmail.com

বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার প্রদান

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২৫ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৫ উপলক্ষ্যে ২৫শে জুন রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার ২০২৫, জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৪, বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার ২০২৪ এবং সামাজিক বনায়নে সর্বোচ্চ লভ্যাংশপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের মাঝে পুরস্কার ও চেক বিতরণ করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কারে ২০২৫ সালের চারজন বিজয়ীর মধ্যে রয়েছেন নাটোরের মো. ফজলে রাব্বী (ব্যক্তি পর্যায়), শেরপুর বার্ড কনজারভেশন সোসাইটি (প্রতিষ্ঠান পর্যায়), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. মনোয়ার হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগ (প্রতিষ্ঠান পর্যায়)। প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপ্তকে ২২ ক্যারেট স্বর্ণপদক (দুই ভরি), এক লক্ষ টাকার চেক ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৪ পেয়েছেন ব্যক্তি পর্যায়ে মো. মাহমুদুল ইসলাম, মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী ও প্রফেসর ড. এম. ফিরোজ আহমেদ এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে স্নোটেক্স আউটারওয়্যার লিমিটেড, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার ২০২৪-এর সাতটি শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারীদের মধ্যে রয়েছেন লালমনিরহাটের দলগ্রাম দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, মানিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, দিলরুবা রহমান (টাঙ্গাইল), সোহেল নার্সারি (রংপুর), নাটোরের জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট। পুরস্কারের অংশ হিসেবে প্রদান করা হয় সনদ, ক্রেস্ট ও এক লক্ষ, ৭৫ হাজার এবং ৫০ হাজার টাকার চেক। এছাড়া সামাজিক বনায়নে সর্বোচ্চ লভ্যাংশপ্রাপ্ত ১০ জন উপকারভোগীকে সম্মাননা হিসেবে চেক প্রদান করা হয়। এর মধ্যে মো. শাহাজ উদ্দিন ৬ লাখ ৭ হাজার ৯৫০ টাকা, উকিল মুর্মু ৫ লাখ ৫৭ হাজার ৩২৫ টাকা এবং মোসা. মনোয়ারা বেগম ৪ লাখ ১৬ হাজার ৭০০ টাকা পেয়েছেন।

প্রতিবেদন: পি আর শ্রেয়সী

কবিতার শতবর্ষ: প্রেক্ষিত জসীমউদ্‌দীনের 'কবর'

রফিকুর রশীদ

কবিতা বাঁচে কীসের জোরে, কোন প্রাণশক্তিতে, কোন জাদুমন্ত্রে? একটি কবিতার বেঁচে থাকার জন্যে কী বিশেষ কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন হয়, কিংবা আন্তরিক শুশ্রূষার? গাছপালা, পশুপাখি এমনকি সৃষ্টির সেরা মানবকুলেরও বেঁচে থাকার জন্যে সেবাযত্ন লাগে, আবার সকল পরিচর্যার বাইরে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা এবং প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার অসংখ্য দৃষ্টান্তও আছে এই সৃষ্টিজগতে। প্রশ্ন জাগে– কবিতা বাঁচে কেমন করে? কে বাঁচায় কবিতা? কতদিন বাঁচে কবিতা? এইখানে এসে গভীর এবং গূঢ় রহস্যময় আরেক প্রসঙ্গের অভিঘাত টের পাই– একটি কবিতার আয়ুষ্কাল কত দিন বা কত বছর হতে পারে? জীবজগতের সদস্যদের জীবন-মৃত্যুর সময়-পরিধির মতো না হোক, যেহেতু কবিতারও জন্মসময় আছে প্রকাশ তারিখ আছে, তাই সে কবিতার আয়ুষ্কালেরও প্রশ্ন উঠতে পারে। কবিতার বেঁচে থাকা অথবা আয়ু-পরিধি নিয়ে এতসব প্রশ্নের অবতারণা করা হচ্ছে খাঁটি বাঙালির প্রাণের কবি জসীমউদ্‌দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) কবর কবিতার শতবর্ষ উদ্‌যাপনের মহার্ঘ্য সুযোগ এসেছে বলেই। সত্যিই ভাবনা হয়– কবিতা বাঁচে কতদিন?

কবিমাত্রই অমরত্বের বাসনাতাড়িত হয়ে কাব্য রচনা করেন– এমন করে না বললেও এটা তো ঠিক যে প্রধানত নিজের আনন্দের জন্যে কবিতা লেখেন কবি। সেই সাথে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষার বীজও কবি হৃদয়ের খুব নিভৃতে রোপিত থাকা একেবারে স্বাভাবিক ঘটনা। কবি জসীমউদ্‌দীন ঠিক কত তারিখে সুবিখ্যাত 'কবর' কবিতাটি রচনা করেন সেটা সঠিক জানা না গেলেও নানান বিবেচনায় সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা *কল্লোল*-এর ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় (১৯২৫ সালের জুন-জুলাই) প্রকাশের কাল হিসাবে নিয়ে দেখলে এ বছর হয় এ কবিতার শতবর্ষপূর্তি। তার মানে এই 'কবর' কবিতার বয়স হয়ে গেল একশো বছর। ঘটনাটি বাংলা কবিতার ইতিহাসে মোটেই বিরল ঘটনা নয়, এমন শতাব্দী প্রাচীন কবিতা আমাদের ভাণ্ডারে আরও অনেক আছে। কিন্তু সে সব কবিতা কালের ধূলিকণার আড়ালে সৌন্দর্য এবং আবেদন হারিয়েছে অনেক আগেই। কালজয়ী কবর কিন্তু জন্ম থেকে অদ্যাবধি একটুও মলিন হয়নি, সৌন্দর্য, সৌকর্য এবং প্রাণপ্রাচুর্য, জনপ্রিয়তার ঘাটতি হয়নি একটুখানিও। বরং খানিকটা গর্ব করেই বলা যায়– দিনে দিনে আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে একদা কথিত 'গ্রাম্য কবিতা'টি নব মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে এবং এই কবিতাটির মধ্যে দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাংলা কাব্যের নাড়ির স্পন্দনের বার্তা উপস্থাপিত হচ্ছে, মানবহৃদয়ের চিরন্তন আর্তনাদ ও হাহাকার মর্মরিত হচ্ছে। সেই অর্থে 'কবর' এখনো আধুনিক কালের কবিতা বলেই বিবেচনার দাবি রাখে।

মোদ্দা কথা জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতার একশো বছর পূর্ণ হলো। ১৯২৫ সালে *কল্লোলে* প্রকাশের পর থেকে এ নাগাদ এটি কত শত পত্রপত্রিকায় এবং বইয়ের পৃষ্ঠায় যে পুনঃমুদ্রিত হয়েছে, কত যে বিশ্ববিদ্যালয় আর শিক্ষাবোর্ডের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কোন কোন ভাষায় যে অনূদিত হয়েছে, তার সঠিক হিসাবের কোনো লেখাজোখা নেই। গত একশো বছরে কত শত সহস্রবার এই কবিতাটি প্রবল অনুরাগে আবৃত্তি করা হয়েছে স্কুল-কলেজের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, পাড়া-মহল্লার বিচিত্রানুষ্ঠানে, রেডিও-টেলিভিশনে। কত যে দর্শক শ্রোতা পাঠকের হৃদয়নিংড়ানো অশ্রুজলে স্নাত হয়েছে শোকাকুল এই অমর কবিতাটি! সত্যিকার অর্থে বাংলা কাব্যভুবনে কবর কবিতা অনন্য উজ্জ্বল এবং অনতিক্রম্য মাইলফলক হয়ে আছে এবং আরও বহুকাল থাকবেও। পাঠকপ্রিয়তা এবং জনপ্রিয়তার বিবেচনা থেকে এই কবিতার সঙ্গে তুলনা করা চলে কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' ও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'কাজলা দিদি' কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছিন্নমুকুল' কবিতার। কী সৌভাগ্য এ কবিতার, জন্মের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কবিতাটি দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং অতি অবশ্যই দীনেশচন্দ্র সেনের।

কৌতূহল জাগতেই পারে– কী আছে এই কবিতার মধ্যে? কোন শক্তিতে কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে পাঠকহৃদয়ে আবেগপ্লাবণ জাগিয়ে এভাবে এগিয়ে চলেছে? কবিতাটির প্রথম প্রকাশ, ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আনুকূল্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভ, ইংরেজিতে কবিতাটির অনুবাদ প্রকাশ এবং কবিকে নিয়ে প্রশংসাসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স ক্লাসের পাঠ্যসূচিতে এই কবিতার অন্তর্ভুক্তি– কবরকেন্দ্রিক এইসব তথ্য এখন কিংবদন্তির মতো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তাই আবারও সেই প্রশ্নই উঠে আসে, কী আছে এই সর্বশোকপ্লাবী কবিতাটির মধ্যে?

প্রথমেই কবুল করতে হয় যে জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতার মধ্যে মর্মছেঁড়া ক্রন্দন আশ্রয়ী বেদনাবিধুর গল্প আছে, আছে

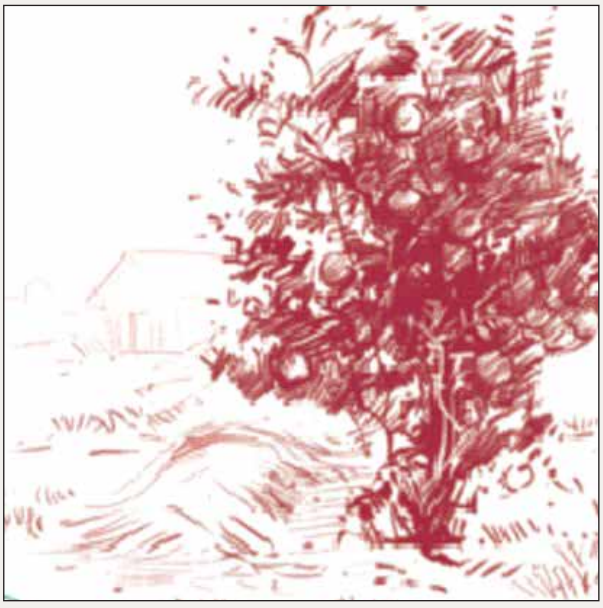

গ্রামবাংলার সাধারণ কৃষকের জীবনযাপনের প্রাণবন্ত ছবি, শুধু বেদনার নান্দীপাঠ নয়, প্রীতিমধুর দাম্পত্যস্মৃতি হাসি-তামাশা ও গ্রামীণ জীবনচিত্র এ কবিতাটির প্রাণসম্পদ হয়ে আছে। কবর কবিতার গল্পে আমরা পাই– গ্রামীণ পটভূমিতে জীবন কাটানো এক বৃদ্ধ পিতামহ একমাত্র জীবিত পৌত্রকে তার প্রেমময়ী স্ত্রী, উপযুক্ত পুত্র, লক্ষ্মীমন্ত পুত্রবধূ, আদরের নাতনি এবং স্নেহের পুত্তলি সাত বছরের শিশুকন্যার বিয়োগান্তক বিদায়ের কথা জানাতে গিয়ে এক দুর্বিষহ মরুময় জীবনের দুঃস্বপ্নের বিবরণ তুলে ধরেছেন। নিকটতম স্বজনদের হারিয়ে তার মনে হয় এ জীবন আর বহন করে চলতে পারছেন না তিনি, মৃত্যুই শ্রেয় তার কাছে। তাই তিনি কামনা করেন, 'ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে, অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।' 'কবর' হচ্ছে শোক ও বেদনামথিত অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাসে উচ্চারিত এক স্মৃতিপর্বের গাথা। কবিতাটির মূল কাহিনির মধ্যে পাঁচটি মৃত্যু যেভাবে বারংবার উপস্থাপিত হয়েছে, কবির অসামান্য প্রকাশভঙ্গির কারণে একবারের জন্যেও সেটির আবেদন ক্ষুণ্ন হয়নি। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান যথার্থই বলেছেন, 'পৌনঃপুনিকতা সত্ত্বেও তাতে আশ্চর্যজনক সংযম আছে, সরলতা সত্ত্বেও আছে তীব্রতা। কবির ভাষা প্রমিত বাংলা-ই, তার সঙ্গে মিশেল আছে আঞ্চলিক শব্দের– কিছু, কিন্তু প্রচুর নয়। এর ছন্দ ও অলংকারও অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু কবিতার আগাগোড়াই ধ্বনিত হয় আন্তরিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা, যার ফলে এর বিষয়বস্তু হানা দেয় পাঠকের মর্মমূলে।' কবিতাটির সম্পূর্ণ অবয়বজুড়ে মৃত্যুর মুহুর্মুহু আবির্ভাব এবং বিষাদের ছায়া পাঠকের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে তীব্র হাহাকার।

'কবর' কবিতায় উল্লেখ আছে পাঁচটি কবরের। বৃদ্ধ দাদু তার নাতিকে এই পাঁচটি কবরে শায়িত পাঁচজন নিকটাত্মীয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং কবরগুলো একে একে চিনিয়ে দেন। এই বিবরণ হয়ে ওঠে মর্মবিদারী গল্পের মতো। শুধু কবর চেনানো তো নয়, কবরে শায়িত প্রিয়জনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি তৎকালীন বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের চিত্রও তুলে ধরেছেন শৈল্পিক ভাষায়। বেদনাবিধুর এ আখ্যানের শুরু হয়েছে বৃদ্ধের স্ত্রী, অর্থাৎ নাতির দাদির কথা দিয়ে। দাদু চিনিয়ে দিচ্ছেন নাতিকে–

এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।

নাতি তো কখনো দেখেনি, দাদি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেও না। কাজেই নাতির সামনে দাদিকে যথাযথভাবে উপস্থাপনেরও দায় বোধ করেন দাদু।

পুতুলখেলার বয়সি এক গ্রাম্য কিশোরীর সঙ্গে বিয়ে হয় দাদুর। পুতুলের বিয়ে ভেঙে যাবার বেদনায় কেঁদে বুক ভাসালেও তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক যে কত মধুময় হয়ে ওঠে, কবি সেই সুখস্মৃতিরও একটু একটু বিবরণ তুলে ধরেন দাদুর জবানিতে। লাঙল কাঁধে নিয়ে মাঠে যাবার সময় দাদু বার বার ফিরে ফিরে দেখে নিতেন স্ত্রীর সোনামুখ। দাদুর প্রতিও দাদির ছিল গভীর ভালোবাসা। তারই প্রকাশ দেখি কবিতায়–

বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা
আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজানতলীর গাঁ।

দাদুও হাটে তরমুজ বিক্রি করে সেই পয়সায় পুঁতির মালা, তামাক ও মাজন কিনে শ্বশুরবাড়ি যেতেন দাদিকে দেখতে। অভিমানী দাদি 'নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া এতদিন পরে এলে!'

স্ত্রীর কবরের পর বৃদ্ধ দাদু চিনিয়ে দেয় পাশাপাশি দুটি কবর, সেখানে ঘুমিয়ে আছে তার পুত্র এবং পুত্রবধূ, অর্থাৎ নাতির বাবা-মা। তাদের নিবিড় ভালোবাসার ছবিও উঠে আসে–

জোড় মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু-ছায়
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।

জোনাকি-মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো ঝিঁঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।

এরপর দাদু বুজির কবর বলে পরিচয় করিয়ে দেন তার নাতনির অর্থাৎ নাতির বড়ো বোনের কবরের সঙ্গে। এই পর্বে নাতনির ওপরে শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে কবির বর্ণনায়। 'পরীর মতন মেয়ে'কে শ্বশুরবাড়ির লোকজন 'হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।' শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে আনা হলেও দুঃখিনী এই মেয়েটি (নাতনি) এক সময় ভালোবাসাহীন পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেয়। কবির ভাষায়–

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো
কবরে তাহারে জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো।

কবর কবিতার বিষাদময় বর্ণনায় সব শেষে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে বৃদ্ধ দাদুর কনিষ্ঠা কন্যা মাত্র সাত বছরের মেয়ের কবরের প্রতি। ফুলের মতো ফুটফুটে এই কিশোরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি জানাচ্ছেন, রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে। অবুঝ এই কন্যার অবেলায় মৃত্যু হয়েছে সাপের কামড়ে। গ্রাম্য পরিবেশে এমন মৃত্যু অস্বাভাবিক নয় মোটেই। কিশোরী কন্যার এই অকালপ্রয়াণ দাদুকে একেবারে দুমড়ে- মুচড়ে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। বৃদ্ধ দাদু পরিবারের পাঁচজন প্রিয় মানুষকে হারিয়ে একমাত্র নাতির সামনে হাহাকার করে ওঠেন, 'যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।' তিনি বেঁচে আছেন বটে এখনো, কিন্তু তার অবস্থা পাগলপ্রায়। তার মনে পড়ে যায়–

এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।

জীবনের অন্তিমবেলায় এসে বৃদ্ধ দাদু মসজিদের আজানের মধ্যে সকরুণ সুর শুনতে পাচ্ছেন এবং তাঁর অন্তরের গভীরে ভাবনার উদয় হচ্ছে, 'মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর!' আর কিছু নয়, কোনো স্বপ্ন নয়, প্রত্যাশা নয়, সবশেষে তিনি নাতিকেই আহ্বান জানাচ্ছেন–

জোড়হাত দাদু মোনাজাত কর, আয় খোদা রহমান।
ভেস্ত নসিব করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ।

পারিবারিক কবরস্থানের ডালিম গাছের তলে দাঁড়িয়ে দাদুর একক জবানিতে বর্ণনা দিতে দিতে নিজ পরিবারের তিন প্রজন্মের বিয়োগব্যথায় কাতর সকরুণ অশ্রুভেজা কবর কবিতাটি এভাবেই শেষ হয়েছে। কিন্তু পাঠক কিংবা শ্রোতার ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ে কবিতার রেশ রয়ে গেছে দীর্ঘদিন। এই কবিতার বেদনাত্মক দিকটির কারণেই শুধু নয়, কবি জসীমউদ্‌দীনের সহজসরল ভাষা ও গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ প্রকাশভঙ্গির কারণে কবর কবিতাটি পাঠকের অন্তরে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। যে ব্যক্তি একবার মাত্র পাঠ করেছে বা আবৃত্তি শুনেছে প্রবল আবেগময় এই কবিতা, তার পক্ষে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এভাবেই পাঠকের ভালোবাসার শুশ্রূষায় বছরের পর বছর বেঁচে থাকে জসীমউদ্‌দীনের কালজয়ী কবর। ড. দীনেশচন্দ্র সেন একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায়েই জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় দূরাগত রাখালের বংশীধ্বনি শুনতে পান, তাঁর অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে, এমনকি অসংকোচে জানান এই কবিতা পড়ে তিনি চোখের জলও ফেলেছেন।

জসীমউদ্‌দীনের কবিতার মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তার কবিতার ভাব ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখায় আছে। অতি সহজেই যাদের লিখবার ক্ষমতা নেই এমনতরো খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না। এই 'খাঁটি জিনিস' দিয়ে গড়া বলেই কবর কবিতাসহ তাঁর অধিকাংশ রচনায় বাঙালির প্রাণের স্পন্দন সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

এ প্রসঙ্গে কবি সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্যও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, জসীমউদ্‌দীন বাংলা কাব্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন 'কবর' কবিতাটি নিয়ে। এ কবিতার মধ্যে অতর্কিতে আমরা একটা নতুন বেদনার সুর শুনতে পেলাম। অসাধারণ হৃদয়াবেগ বা বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ নেই, অথচ সাধারণ জীবনের তুচ্ছ বেদনা যে এত মর্মান্তিক হতে পারে তার পরিচয় আমরা আগে পাইনি। হুমায়ুন কবির বলেন, 'দেশের গণমানসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাব্যে রূপান্তরিত করতে পারাই জসীমউদ্‌দীনকে কাব্যসিদ্ধি দিয়েছে।' আর এই সব কারণেই জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা কেমন অনায়াসে শতবর্ষের পরিক্রমা শেষেও সমান জনপ্রিয় থেকে যায়, পাঠকচিত্তে চিরসবুজের আবেদন রেখে যায়। তিরিশের দশকের সমসাময়িক কবি হওয়া সত্ত্বেও নজরুলের মতো করেই জসীমউদ্‌দীন একান্ত নিজস্ব কাব্যধারা সৃষ্টি করে নিয়েছেন। সময়ের চোরাবালিতে আটকে পড়ে সমসাময়িক অনেক কবিই হারিয়ে গেছেন গভীর আবর্তে, জসীমউদ্‌দীন এখনো সজীব সপ্রাণ সাহিত্যসত্তা নিয়ে বাংলা কাব্যধারায় অস্তিত্বমান আছেন, এ তাঁর বিরাট সাফল্যই বটে।

শারীরিকভাবে মানুষের বাঁচা-মরার বিষয়ে কোনো সংশয় নেই, নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ তবু বাঁচতে চায় তার কীর্তি দিয়ে সৃষ্টি দিয়ে। কতদিনের সেই বাঁচা? না, তার কোনো সীমারেখা নেই। আকাঙ্ক্ষার কোনো সীমানা থাকে না হয়ত। '১৪০০ সাল' শীর্ষক কবিতা রচনার সময় (১৩০২ বঙ্গাব্দ বা ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) রবীন্দ্রনাথ যেনবা নিশ্চিত ছিলেন শতবর্ষ পরেও তাঁর কবিতা পঠিত হবে, তবে সেই সময়ের 'কোনো ফুল বিহঙ্গের' গান 'অনুরাগে সিক্ত' করে অনাগত সেই পাঠককে পাঠাতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সামান্য সংশয় থাকলেও ভবিষ্যতের কবিদের উদ্দেশে তিনি অভিবাদন জানিয়ে রেখেছেন ঠিকই। সে কবিতার শতবর্ষ পার হবার অনেক আগেই, বত্রিশ বছরের মাথায় (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ বা ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে) অনুজ কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঐ একই শিরোনামে (১৪০০ সাল) কবিতা লিখে অগ্রজ রবীন্দ্রনাথকে আশ্বস্ত শুধু নয় একেবারে নিশ্চিত করে জানান যে– 'যৌবন-বেদনা-রাঙা' সেদিনের কবিতাটি পরবর্তী সময়ের কবি ও পাঠক 'অনুরাগভরে' পড়ছে। সত্যি বলতে কি 'যুগের হুজুগ' কেটে গেলে বাঁচা বা না-বাঁচার পরোয়া না করা নজরুলের 'বিদ্রোহী'ও শতবর্ষী হয়েছে পাঠকনন্দিত হয়েই। কিন্তু বাংলাদেশের পদ্মাবিধৌত নিভৃত শহর ফরিদপুরে বসে জসীমউদ্‌দীনের লেখা 'কবর' কবিতার আয়ুষ্কাল নিয়ে কেউ কি কখনো ভাবতে পেরেছে? কবি নিজেও কি কোথাও কখনো কবিতাটির এমন শতবর্ষী হবার সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন? না, এমন তথ্য আমাদের জানা নেই। কবিতাটি বিশেষ কারও আশীর্বাদের তিলক মাথায় পরে আবির্ভূত হয়েছে এমনও নয়। তবু এ কবিতা বাংলা ভাষার সকল পাঠকের বুকে অনড় এক আসন পেতে আসীন হয়ে আছে শতবর্ষ জুড়ে, আরও কত বছর অটল থাকবে এই আসন, আমরা কেউ সেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। আমরা কেবল প্রত্যাশা করতে পারি, কালের খেয়ায় চেপে জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা আরও বহু যুগের পাঠকের কাছে নন্দিত বন্দিত আদৃত হবে, অমল ধবল সেই খেয়া যাবে আরও বহুদূর।

রফিকুর রশীদ: শিক্ষাবিদ ও বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক

৫ই আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা

সরকার ৫ই আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রতিবছর এ তারিখকে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে পালনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন সংক্রান্ত 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে বলা হয়েছে। ২৫শে জুন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক পরিপত্রের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদন: জুয়েল মোমিন

বাংলা সাহিত্যে বর্ষাকাল

মনজুর-ই-আলম ফিরোজী

আজ থেকে পৌনে একশত বছরেরও বেশি আগে (১৩৫৩ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত মাসিক *বসুমতি*র আষাঢ় সংখ্যাটি আমার কাছে রক্ষিত আছে। এ সংখ্যার একটি বিশেষ দিক ছিল আষাঢ় তথা বর্ষাকালকে নিয়ে সৌখিন আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় প্রথম বিজয়ীকে ১০ টাকা, দ্বিতীয় বিজয়ীকে ৮ টাকা এবং তৃতীয় বিজয়ীকে ৫ টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা ছিল। এতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের ৫টি আলোকচিত্র ছাপা হয়, যাতে নিম্নে বর্ণিত আলোকচিত্রীর নাম এবং ক্যাপশন রয়েছে:

আলোকচিত্রীর নাম	ক্যাপশন	পৃষ্ঠা
রামকিঙ্কর সিংহ	জেলে	২৭৭
পৃথিশ মজুমদার	জেলে	২৭৮
নীরোদ রায়	নীল নবঘনে, আষাঢ় গগনে	২৭৯
শৈলেন দে	এমন ঘনঘোর বরিষায়	২৮০
শৈলেন দে	আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে	২৮০

বর্ষায় কবি-সাহিত্যিকদের ভাবালুতা চিরন্তন অধ্যায়। সেই সুদূর থেকে বর্ষাকালকে নিয়ে রচিত হচ্ছে সাহিত্য। চলছে বর্ষা বন্দনা। কবি কালিদাস থেকে শুরু করে বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের বর্ণনায় বর্ষা হয়ে উঠেছে আরও সংগীতময়, আরও মোহনীয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জসীমউদ্‌দীন, আহসান হাবীব, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা প্রমুখের রচিত কবিতা ও গানে, প্রমথ চৌধুরীর বর্ষা প্রবন্ধে বর্ষার অনুপম বর্ণনা মেলে। আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেও বর্ষা বন্দনা চলছেই।

বর্ষাকে নিয়ে লেখার যেন শেষ নেই। প্রকৃতির শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ করার সেরা উপহার বর্ষাকাল । বর্ষার বৃষ্টিস্নাত দিনগুলোয় সোনা ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাকাডাকি, লাফালাফি, ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজ, রাতে জোনাকি পোকার মিটিমিটি আলো মানবমনে ছায়াপাত করে। তাইতো অজান্তেই মনের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসে বর্ষার অপরূপ রূপবৈচিত্র্যের কথামালা, যাতে রচিত হয় সাহিত্য। বর্ষাকাল নান্দনিক, অনন্য, প্রাণবন্ত উচ্ছলতার প্রতীক। এর সাথে জড়িয়ে আছে মানবকুলের চিরায়ত প্রেম-বিরহ-হাসি-কান্না-রাগ-অনুরাগ-আনন্দ-বেদনা। সৌন্দর্যে, দাক্ষিণ্যে, প্রভাবে বর্ষা ঋতু তুলনাহীন। বর্ষাকে ঘিরে কবিগুরুর অসংখ্য কবিতা, গান সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি লিখেছেন,

নীল নবঘনে, আষাঢ় গগনে, তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে..

বর্ষাকে নিয়ে কবিগুরুর অসংখ্য লেখার মধ্যে আরও দুই-একটি উল্লেখ করছি,

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
...
এমন দিনে মন খোলা যায়–
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।

বর্ষা নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানের মধ্যে 'আকাশতলে দলে দলে মেঘেরে কে যায়, আয় আয় আয়', 'আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে', 'শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে?', 'ঝমঝম ঘন ঘন রে পরশে' প্রভৃতি অনুপম, অনন্য।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে অতিষ্ঠ প্রকৃতি, প্রাণী ও মানবকুল বর্ষাকালের বৃষ্টির জন্য চাতক পাখির ন্যায় প্রতীক্ষা করে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটার অবসান ঘটাবে বর্ষা, জীবন ও প্রকৃতিতে বৃষ্টিস্নাত হিমেল বাতাস প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেবে।

বর্ষারম্ভেরকালে প্রকৃতি ও মন চনমনে হয়ে ওঠে। কী অপরূপ স্নিগ্ধতা ছড়ায় বর্ষা! আহা! মরি, মরি। জাতীয় কবি নজরুলের

বর্ষাকেন্দ্রিক কবিতায় এমন কথামালাই ফুটে উঠেছে–

আদর-গর-গর
বাদর-দর-দর
এ তনু ডর-ডর
কাঁপিছে থর-থর।
নামে ঢল-ঢল
সজল ছল-ছল
কাজলকালো জল
ঝরে লো ঝর-ঝর

(ছায়ানট, শ্রাবণ ১৩২৮)

নজরুলের লেখা 'এসো হে সজল শ্যামল ঘন দেয়া', 'বরষা ঋতু এলো এলো', 'বাজে মৃদঙ্গ বরষার' প্রভৃতি গানের কথা ও সুর হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

বর্ষার দৃশ্যপট বড়োই নান্দনিক। চারদিকে থই থই পানির নৃত্য। আকাশ ভরা জমাট কালো মেঘ ফুঁড়ে ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি। শনশন, ঝনঝন, পাগলপারা প্রকৃতি। কেয়া, কদম্ব, জুঁই, চামেলি, গন্ধরাজ, নাগ কেশর, আরও কত ফুলের বাহারি রূপ-গন্ধ। জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, তাল, নারকেল, ফজলি আমের রসে রসনাতৃপ্তি। পাঁচে, তালের পিঠা, নলেন গুড়ের পিঠা, চালের নাশতায় ঢেকুর তোলা– এসবই বর্ষার অনুপম অনুসর্গ। ঠিক যেন কবিতার মতো সময়গুলো।

টিনের ঘরের চালে ঝমঝমাঝম বৃষ্টির ছোটো ফোঁটা, বড়ো ফোঁটা নানা সুরের লহরি তোলে। সে সুর কখনো জোরে, কখনো আস্তে, কখনও বা কান বিদীর্ণ আওয়াজ তোলে। চালে পতিত পানি একাকার হয়ে টিনের ঢেউ গলিয়ে যখন সমান্তরালে, সর্পিলাকারে নীচে পড়ে– সে দৃশ্য দুচোখকে সার্থক করে তোলে।

বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরীর 'বর্ষা' প্রবন্ধের প্রথম লাইনটি হলো– এমন দিনে কী লিখতে মন চায়?

তিনি লিখেছেন, 'যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। আর কানে আসছে তার একটানা আওয়াজ; সে আওয়াজ কখনো মনে হয় নদীর কুলুধ্বনি, কখনো মনে হয় তা পাতার মর্মর। আসলে তা একসঙ্গে ও দুই-ই; কেননা আজকের দিনে জলের স্বর ও বাতাসের স্বর দুই মিশে এক সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন দিনে মানুষ যে অন্যমনস্ক হয় তার কারণ তার সকল মন তার চোখ আর কানে এসে ভর করে। আমাদের এই চোখ পোড়ানো আলোর দেশে বর্ষার আকাশ আমাদের চোখে কী যে অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয় তা বাঙালি মাত্রই জানে।'

প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, 'বাংলার বর্ষা রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন। ও ঋতুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ভারতী ভরপুর, তার ভীমমূর্তি আর তার কান্তমূর্তি, দুই-ই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে।' প্রবন্ধে সেকালের একটা কবিতার উল্লেখ করে তিনি সেটিকে গীতগোবিন্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর কাব্য হিসেবে তার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। সেটি এই–

রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

মেঘ, বিজলি, বৃষ্টি, ভরা নদী, থই থই জলে ডুবে যাওয়া পথ, বর্ষণমুখর দিন ও রাত্রি, মাঠ বিস্তৃত আমন ধানের হাওয়ায় দোলানো অনুভূতি এসবই কবিমনকে আরও বিচলিত করে তোলে। এমনকি ঘরে আটকা নিরস মানুষটিও বৃষ্টির আবাহনে গুনগুনিয়ে গানের কলি আওড়াতে থাকে।

পুকুর, ডোবায় বৃষ্টির ফোঁটা পতনে যেন খই ফোটে। রাশি রাশি ফোঁটায় সৃষ্ট ছোটো ছোটো ঢেউগুলো একটা আরেকটার মাঝে লীন হয়ে যাওয়ার দৃশ্য বড়োই মনোহর লাগে। গৃহস্থের ঘাটে বাঁধা নৌকাটি বৃষ্টির ঝাপটার সাথে প্রবাহমান সমীরণে কখনো মৃদু, কখনো জোরে দুলে ওঠে। এমন দৃশ্য কদাচিৎ মেলে।

গাছগাছালির পত্র-পুষ্প-ডালে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে কী সুন্দর মুক্তদানার মতো ঝরে পড়ে। আঙিনায় কিংবা বহিরাঙ্গনে বৃষ্টির পানিতে গা ভেজানোর জন্য নেমে পড়ে দুষ্টু ছেলের দল।

বর্ষাকাল বিধাতার আশীর্বাদ হয়ে আসে। ধরণিকে তরু-পল্লবে ভরিয়ে দেবার ক্ষেত্রে বর্ষার ভূমিকা অপরিসীম। মাছে-ভাতে বাঙালির দুই উৎসেরই প্রধান ক্রীড়নক বর্ষাকাল। আউশ হলো গ্রীষ্ম ও বর্ষালগ্নের ফসল। বর্ষারম্ভের পর আমন ধান বেড়ে উঠতে থাকে। এই আমনধানই কৃষকের মুখে হাসি ফোটায়। বর্ষা শেষে হেমন্তে মাঠে মাঠে যে সোনালি ধান ঝিলিক দিয়ে ওঠে তার কৃতিত্ব বর্ষাকালের।

গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ আর গোয়াল ভরা গরুর যে উপাখ্যান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিরাজমান তার অণুঘটক কিন্তু বর্ষাকাল। বাংলাদেশের স্বর্ণালি আঁশ 'পাট' বর্ষাকালের ফসল। বর্ষায় তোষা পাটের জমিতে হাঁটু পানি, কোমর পানি এমনকি গলাপানি মাড়িয়ে কৃষক পাট কাটেন। সে পাট 'জাগ' দেওয়া হয় বর্ষার পানিতেই। পাটের জাগ টেনে এনে কৃষক তার বাড়ির কাছেই বেঁধে রাখেন, সেটা বর্ষার দৌলতে। পাটের আঁশ পচে গেলে কৃষক সোলা থেকে পৃথক করেন বাড়ির আঙিনাতেই।

কৃষকবধূ মনের আনন্দে পাট শুকান। মনে কত পরিকল্পনা, পাট বেচে কতকিছু করবেন তারা। এমনকি, গ্রামে কখনও কখনও বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয় পাট বিক্রির তারিখের ওপর ভিত্তি করে। নৌকাযোগে পাট হাটে নিয়ে যান কৃষক। কৃষকপুত্রও তার সঙ্গে হাটে যায়। মহাজনের কাছে পাট মেপে দিয়ে কয়েকটা কড়কড়ে নোট পান কৃষক। ওটাই যে তার নগদ প্রাপ্তির উৎস। পাট বেচে তার খুশি আর ধরে না। সে খুশির সীমা-পরিসীমা নেই।

বর্ষাকালে মাছ ধরা উৎসবের মতো। বড়োরা এমনকি ছোটোরাও মাছ ধরার জন্য বৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জাল যেমন– তইড়াজাল, ছিপজাল, ঝাঁকিজাল, পলো, দাঁড়কি ইত্যাদি নিয়ে বের হয়। ঝুম বৃষ্টির মধ্যে মাছেরা যেমন মনের আনন্দে সাঁতার কাটায় ব্যস্ত থাকে, মানুষেরাও সেই অমোঘ সুযোগটি কাজে লাগায়। তাদের খালুইগুলো ছোটো-বড়ো মাছে ভরে যায় আর সেসব নিয়ে আনন্দে ঘরে ফিরে।

তবে কষ্টও পরিদৃষ্ট হয়। গ্রামে অনেক বাড়িতেই বৃষ্টির দিনে চুলো জ্বলে না। গৃহিণীর রান্নাঘর বৃষ্টিতে ভিজে যায়। গ্রামে রান্নাঘর বলতে ছন বা খড়ের তৈরি ছোটো একটি ঘরই বোঝায়, যেখানে থাকে একটি বা দুটি মাটির চুলো। অনেকের তাও থাকে না। উঠোনের এককোনে মাটির চুলো। উপরে ছাউনি বলতে নীলাকাশ। বৃষ্টির আগমনবার্তা পেলেই চাড়ি দিয়ে চুলো ঢেকে ফেলা হয়। রান্না বন্ধ। তাহলে ক্ষুণ্নিবৃত্তি হবে কীভাবে?

এটা সত্যি যে, ধনীদের জন্য বর্ষা এক বিলাসী সময়। নানা উপাদেয় আহারে তাদের ভূরিভোজ চলে। আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টিকেন্দ্রিক জটিলতায় কোনো কোনো গরিবের বাড়িতে চুলোয় হাঁড়ি চাপে না। বসতঘরের মধ্যে পাটশোলা জ্বালিয়ে একটু চাউল ভেজে কিংবা 'খুদ' ভেজেই জঠরানলের খানিক নির্বাপিত হয়। অনেকে অর্ধাহার বা অনাহারেই কাটায়। বৃষ্টি বিলাস একালেও ধনীর, সেকালেও ধনীরই ছিল।

এভাবেই অনাদিকাল থেকে উপমহাদেশের কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, কিষান-কিষানি, জেলে-তাঁতি, ছোটো, বড়ো, ধনী, গরিব নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষ বর্ষাকালকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করে যাচ্ছেন।

মনজুর-ই-আলম ফিরোজী: নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, firozeebondhon@gmail.com.

বিনিয়োগকারীবান্ধব নতুন ওয়েবসাইট চালু করল বিডা

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নতুন ডিজাইনের ওয়েবসাইট ২৮শে জুন আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্মটি বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিকাঠামোকে আরো সুগম করতে এবং বিনিয়োগকারীদের এদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নতুন প্ল্যাটফর্মে বিডা'র ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) হিটম্যাপে চিহ্নিত বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে বিনিয়োগকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা, নীতিগত দিকনির্দেশনা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্ধারিত ফোকাল পয়েন্টদের তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। বিডা'র লোগোটিও নতুনভাবে রূপায়ণ করা হয়েছে।

বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেন, বিডা'র পুরোনো ওয়েবসাইটটি সাধারণ সরকারি পোর্টালের মতো ছিল। এটি সক্রিয়ভাবে বিনিয়োগ সহায়তা দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল না। নতুন প্ল্যাটফর্ম স্পষ্টতা এবং কৌশলগত সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে নির্মিত একটি বিনিয়োগকারীবান্ধব সেবা মডেলের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নতুন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী ও অংশীদারদের অবহিত করা হচ্ছে, যাতে তারা বাংলাদেশের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গঠনের অঙ্গীকার সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা পান।

বিডা'র হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট নাহিয়ান রহমান রচি বলেন, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা সাধারণত কোনো দেশে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেই দেশের বিনিয়োগ সংস্থার ওয়েবসাইটের তথ্যের ভিত্তিতে বিনিয়োগের সম্ভাব্য খাত মূল্যায়ন ও শর্টলিস্ট করে থাকেন। তাই এ প্ল্যাটফর্মগুলো বিনিয়োগসংক্রান্ত তথ্য প্রদান, বিনিয়োগকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং দেশের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাসমূহ তুলে ধরার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে কোনো বিনিয়োগকারী একটি দেশ নিয়ে আগ্রহ দেখাবেন, নাকি অন্য বিকল্প বিবেচনা করবেন তা নির্ভর করে সেদেশের ওয়েবসাইটের তথ্যের ওপর। এ কারণেই বিডার নতুন ওয়েবসাইটটি ডিজাইন করা হয়েছে বিনিয়োগকারীদের যাত্রার বিভিন্ন স্তরকে বিবেচনায় রেখে-যেখানে একজন বিনিয়োগকারী সুযোগ খোঁজা, বাজার সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা এবং সর্বশেষে সফল বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত দেশের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন।

প্রতিবেদন: মো. ফুয়াদ হাসান

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি কায়কোবাদ

আলম শামস

মহাকবি কায়কোবাদ বা মুন্সী কায়কোবাদ বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য কবি যাকে মহাকবিও বলা হয়। তার প্রকৃত নাম কাজেম আল কোরায়শী। মীর মশাররফ, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হকের মধ্যে কায়কোবাদই হচ্ছেন সর্বতোভাবে একজন কবি। কাব্যের আদর্শ ও প্রেরণা তার মধ্যেই লীলাময় হয়ে ওঠে। সেজন্য একথা বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায় যে কবি কায়কোবাদই হচ্ছেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি। তিনি বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট রচয়িতা।

মহাকবি কায়কোবাদ ১৮৫৭ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা জেলা জজ কোর্টের আইনজীবী মরহুম শাহামাতুল্লাহ আল কোরেশী ও মরহুম জোমরাত উন্নেসা ওরফে জরিফুন্নেসা খাতুন এর ছেলে। কায়কোবাদ সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে অধ্যয়ন করেন। বাবার অকালমৃত্যুর পর তিনি ঢাকা মাদ্রাসাতে বর্তমান কবি নজরুল কলেজে ভর্তি হন। যেখানে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দেননি। তিনি পোস্টমাস্টারের চাকরি নিয়ে তার স্থানীয় গ্রামে ফিরে আসেন। যেখানে তিনি অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত কাজ করেছেন। ১৯৩২ সালে তিনি কলকাতাতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলন-এর প্রধান অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

মহাকবি কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বিরহ বিলাপ* (১৮৭০)। এরপর *কুসুম কানন* (১৮৭৩), *অশ্রুমালা* (১৮৯৬), *মহাশ্মশান* (১৯০৪)-এটি তার রচিত *মহাকাব্য*, *শিব-মন্দির বা জীবন্ত সমাধি* (১৯২১), *অমিয় ধারা* (১৯২৩), *শ্মশানভস্ম* (১৯২৪), *মহররম শরীফ* (১৯৩৩)– *মহররম শরীফ* কবির মহাকাব্যোচিত বিপুল আয়তনের একটি কাহিনি কাব্য, *শ্মশান ভসন* (১৯৩৮), *প্রেমের বাণী* (১৯৭০), *প্রেম পারিজাত* (১৯৭০) প্রভৃতি।

বাংলা মহাকাব্যের অস্তোন্মুখ এবং গীতিকবিতার স্বর্ণযুগে মহাকবি কায়কোবাদ মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাস থেকে কাহিনি নিয়ে 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য রচনা করে যে দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন তা তাকে বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় আসনে স্থান করে দিয়েছে। সেই গৌরবের প্রকাশে ১৯৩২ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের মূল অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কবি কায়কোবাদ। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি। বাংলা কাব্য সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ তাকে 'কাব্যভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ' ও 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯০৪ সালে প্রকাশিত *মহাশ্মশান* মহাকাব্য রচনা করেই কায়কোবাদ পেয়েছেন মহাকবির খ্যাতি। তিনি কায়কোবাদ বা মুন্সী কায়কোবাদ নামে লিখতেন। উনিশ শতকের কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুসলিম কবি, যিনি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম বাঙালি মুসলমান সনেট রচয়িতা। বলা হয়, তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি।

মহাকবি কায়কোবাদ সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হন খুব অল্প বয়সেই। বাবা-মাকে হারিয়ে ১৩ বছর বয়সে প্রকাশ করেন প্রথম কাব্য *বিরহ বিলাপ*। সব মহলের প্রশংসা তাঁকে সাহিত্যে বিভোর হতে সাহায্য করে। তার কবিতায় ফুটে ওঠে স্বদেশপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যপ্রীতি।

তিনি শুধু কবিতাই লিখতেন না, গানও লিখেছেন। কায়কোবাদ তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমানদের তাদের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন এবং তা পুনরুদ্ধারে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। মুসলমানরা সেই সময় সাহিত্যকে অনেকটা

ঘৃণার নজরে দেখত। মুসলিম কবি-সাহিত্যিকও ছিলেন কম। কায়কোবাদ তখন হিন্দু-মুসলিম সবার দৃষ্টি কাড়েন তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে। তাঁর ধর্মীয় অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন রচনায়।

কবির পিতৃপুরুষগণ বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালে বাগদাদের কোনো এক অঞ্চল থেকে ভারতে আসেন। ১৩ বছর বয়সে ১৮৭০ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বিরহ বিলাপ* প্রকাশ হলে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। গীতিকবিতার স্বর্ণযুগে মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস থেকে কাহিনি নিয়ে *মহাশ্মশান* মহাকাব্য রচনা করে ১৯০৪ সালে তিনি মহাকবি উপাধি লাভ করেন। কবি কবিতা লেখার পাশাপাশি দীর্ঘদিন আগলা ডাকঘরে চাকরি করেন।

মহাকবি কায়কোবাদের 'আযান' কবিতাটির সুর ও ছন্দ মানব হৃদয়ে দোলা দিয়েছিল। কবিতাটি হৃদয়ে আলোড়ন তুলে। এই যেমন–

কে ওই শোনাল মোরে আযানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর, বাজিল কী সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধমনী।
কী মধুর আযানের ধ্বনি!

কী অপূর্ব সুরের মূর্ছনা! চিরায়ত ভালো লাগা এবং ভালোবাসার আবেশ যেন স্বর্গ থেকে এসে হৃদয় আন্দোলিত করে যায়। সেই বিখ্যাত 'আযান' কবিতার সার্থক কবি মহাকবি কায়কোবাদ। কেউ কেউ বলে থাকেন মুন্সী কায়কোবাদ। অবশ্য কবির প্রকৃত নাম মুহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী।

মহাকবি কায়কোবাদের কবিতার বিষয়বস্তু নানামুখী এবং বৈচিত্র্যময়। সহজসরল এবং মেদহীন ভাষায় তিনি লিখেছেন স্বদেশপ্রেমের অসংখ্য কবিতা। এসব কবিতাগুলো পাঠ করা মাত্রই পাঠকের হৃদয় দেশের প্রতি ভাবাবেগে পূর্ণ হয়। 'দেশের বাণী' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

কে আর বুঝিবে হায় এ দেশের বাণী?
এ দেশের লোক যারা/সকলইতো গেছে মারা/
আছে শুধু কতগুলি শৃগাল শকুনি!
সে কথা ভাবিতে হায়/এ প্রাণ ফেটে যায়,
হৃদয় ছাপিয়ে উঠে-চোখ ভরা পানি।
কে আর বুঝিবে হায় এ দেশের বাণী!

কবি হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা এক অসাধারণ নিবেদন। প্রিয় স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি কতটা ভালোবাসা থাকলে এভাবে বলা যায়! শুধু মাতৃভূমি নয়, মাতৃভাষার প্রতিও ছিল কবির অনাবিল ভালোবাসা। তাইতো তিনি 'বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা' কবিতায় লিখেছেন,

> বাংলা আমার মাতৃভাষা/বাংলা আমার জন্মভূমি।/গঙ্গা পদ্মা যাচ্ছে বয়ে,/যাহার চরণ চুমি।/ব্রহ্মপুত্র গেয়ে বেড়ায়,/যাহার পূণ্য-গাথা!/ সেই-সে আমার জন্মভূমি,/ সেই-সে আমার মাতা! ...।

স্বদেশমাতৃকা এবং বাংলা ভাষার প্রতি কবির অপরিসীম মমত্ববোধ আমাদের জন্য, আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য চিরশিক্ষণীয়।

আগেই বলেছি মহাকবি কায়কোবাদের কবিতা বিচিত্রমুখী। তিনি যেমন তাঁর কবিতায় দেশের কথা বলেছেন, ভাষার কথা বলেছেন– তেমনি বলেছেন জীবন ঘনিষ্ঠতার কথা। মানব জীবনের পরতে পরতে লুক্কায়িত আছে হাসিকান্না, আনন্দ-বেদনা, সুখ-অসুখ। তাইতো তিনি তার বিখ্যাত 'সুখ' কবিতায় লিখেছেন,

'সুখ সুখ' বলে তুমি কেন কর হা-হুতাশ,
সুখ ত পাবে না কোথা, বৃথা সে সুখের আশ!
পথিক মরুভূ মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায় জল,
জল ত মিলে না সেথা, মরীচিকা করে ছল!
তেমতি এ বিশ্ব মাঝে, সুখ ত পাবে না তুমি,
মরীচিকা প্রায় সুখ, এ বিশ্ব যে মরুভূমি!

কী অসাধারণ আহ্বান! অন্যের চোখের জল মুছিয়ে দিলে, অন্যের ব্যথা-বেদনা দূর করে দিলে তবেই প্রকৃত আত্মসুখ লাভ করা যাবে। আফসোস করে বলতে হয়, এই উপলব্ধি থেকে আজ আমরা অনেকখানি দূরে। এখন আমরা কেবলই স্বার্থের রশি ধরে টানাটানি করি। অন্যের ক্ষতি করে হলেও নিজের উদর পূর্তি করতে চাই।

আরও একটি কবিতার উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না। দশম শ্রেণিতে পড়েছিলাম প্রিয়কবি কায়কোবাদের 'ভুল ভেঙে দাও' কবিতাটি। যা আজও আমাকে নিরবে-নিভৃতে মহান স্রষ্টার দরবারে নিজেকে নিবেদিত করতে, আত্মসমর্পণ করতে অনুপ্রাণিত করে। কবি বলেছেন,

> প্রভু, ভুল ভেঙে দাও/যে ভুলে তোমারে ভুলে/হীরা ফেলে কাঁচ তুলে। /ভিখারী সেজেছি আমি/আমার সে ভুল প্রভু/তুমি ভেঙ্গে দাও। /প্রভু ভুল ভেঙ্গে দাও। /তুমি বিভু অন্তর্যামী/আমার প্রাণের স্বামী। তুমি ভিন্ন এ জগতে/ নাহি মোর কেউ/প্রভু ভুল ভেঙ্গে দাও ...

কবির এই গভীর আত্মোপলব্ধি এবং স্রষ্টার কাছে করজোড়ে মিনতি যেন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের সতত উচ্চারণ। পৃথিবীর মূলত একটি পান্থশালা। একটি মোহ-মায়া। এই পৃথিবীর প্রভাব, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, সম্পদ এবং অন্যান্য লোভ-লালসায় পড়ে আমরা আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কে ভুলে থাকি। ভুলে যাই। আমরা চেতনে অথবা অবচেতনে হীরা ফেলে কাঁচ নিয়ে মত্ত থাকি। তাই 'ভুল ভেঙে দাও' কবিতা যেন সেই মোহমুক্তির কবিতা। স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মহাকবি কায়কোবাদের জীবনাচরণ এবং কবিতা নিয়ে আরও বেশি আলোচনা এবং চর্চা হওয়া উচিত বলে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি কায়কোবাদ ১৯৫১ সালের ২১শে জুলাই ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। রাজধানীর আজিমপুর গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আলম শামস: লেখক ও সাংবাদিক, dhaka786@gmail.com

বর্ষার পদাবলি

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা–

ঋতু শুধু প্রকৃতিকে নয়, মানুষকেও প্রভাবিত করে। এই প্রভাব সব শ্রেণি-পেশার মানুষের ওপরই লক্ষণীয়। এমনকি কবি এবং কবিতাও গভীরভাবে প্রভাবিত। তাই কবিতায় ছয় ঋতুর উপস্থিতি দেখা যায়। কবিতায় বর্ষার প্রভাব একটু বেশিই। কবিতায় বর্ষা এসেছে কবির স্বপ্ন-কল্পনা, অভিজ্ঞতা আর অনুভবের নিবিড়তায়। এসব বর্ষা বন্দনায় আছে প্রেম, আকুতি-প্রার্থনা, যন্ত্রণা ও আনন্দ। আছে আশাবাদের প্রবল আলোও। কবিদের কবিতায় বর্ষার রূপ বা সৌন্দর্য ধরা দিয়েছে নানান অভিধায়। বর্ষার মায়াবী রূপ আমাদের মোহিত করে, আন্দোলিত করে, শিহরিত করে। আকাশ থাকে গুরুগম্ভীর কালো মেঘের ভারে নিরন্তর অবনত। গর্জন, মেঘ বর্ষণের বিপুল দাপট চলে। যখন ঘন বর্ষার শ্রাবণের মেঘ দলবেঁধে আকাশে উড়ে

বেড়ায়, সে মেঘের সঙ্গে সকল ভাবপ্রবণ মানুষের মনও কল্পনার জগতে উড়ে বেড়ায়। মূলত বর্ষা এলে নদীনালা, খালবিল জলে টইটম্বুর হয়ে যায়। মরা নদীতে জোয়ার আসে। এ ঢেউয়ের দোলা লাগে লেখকচিত্তেও। সাহিত্যের সবগুলো শাখার মধ্যে কবিতায় বর্ষার অনুষঙ্গ এসেছে বারম্বার। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের কবির কাছে বর্ষা ও কবিতা সমার্থক হয়ে ওঠে। তারা বর্ষাকে কবিতার, কবিতাকে বর্ষার পরিপূরক করে তুলেছেন তাদের কবিতার বিভিন্ন কাব্যিক ব্যঞ্জনা, অনুপ্রাস ও দ্যোতনায়। আধুনিক যুগের রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জাতীয় কবি কাজী নজরুল বা পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনসহ বেশিরভাগ কবি বর্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বর্ষা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য পদাবলি। আবার কোনো কোনো কবির হাতে রচিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ এক কাব্য, যার আদ্যোপান্ত বর্ষায় সিক্ত। তবে বাস্তবতার নিরিখে লেখার পরিসর সংক্ষিপ্ত হওয়ায় বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আধুনিক যুগের নির্বাচিত বর্ষার পদাবলি নিয়ে আলোচনা করা যায়।

নারী কবি স্বর্ণকুমারী দেবী বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। বর্ষার চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রাবণ মাসকে দেখেছেন ঘনঘোর বর্ষণের মাস হিসেবে। তাঁর দৃষ্টিতে বর্ষা-চরিত্রের ভাবটি তিনি তুলে ধরেছেন– 'সখি, নব শ্রাবণ মাস/ জলদ-ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা/ ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ!/ ঝিমকি ঝম ঝম, নিনাদ মনোরম,/ মুহুর্মুহু দামিনী-আভাস! পবনে বহে মাতি, তুহিন-কণাভাতি/ দিকে দিকে রজত উচ্ছ্বাস।'

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁর কবিতায় বর্ষায় গ্রামবাংলার প্রকৃতির বর্ণনা তুলে ধরেছেন– 'দীঘিটি গিয়াছে ভরে, সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে,/ কানায় কানায় কাঁপে জল;/ বৃষ্টি-ভরে বায়ু-ভরে নুয়ে পড়ে বারে বারে/ আধফোটা কুমুদ কমল।/ তীরে নারিকেল-মূলে থল-থল করে জল,' কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের বর্ষার এই কবিতাটি এক অর্থে বর্ষায় পল্লিবাংলার এক অপরূপ রূপের বর্ণনা যা অসাধারণ।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় বর্ষা বর্ণিত হয়েছে প্রকৃতির অপরূপ শক্তি হিসেবে। তাঁর কবিতায় বর্ষার প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। 'বর্ষাকাল' কবিতায় কবি বর্ষার রূপকে বর্ণনা করেন– 'গভীর গর্জন সদা করে জলধর, উথলিল নদ-নদী ধরনীর উপর/ রমণী রমণ লয়ে সুখে কেলি করে দানবাদি দেব যক্ষ সুখিত অন্তরে।'

বর্ষার ঘনঘটায় কবি রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। যখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে, এতে তিনি যেমন পুলকিত হয়েছেন, তেমনি আবার মেঘের ঘনঘটা দেখে শঙ্কিতও হয়েছেন। এ কারণেই রবীন্দ্র কাব্য ভাবনায় বার বার ফিরে এসেছে বর্ষা বিভিন্ন আঙ্গিক ও সৌকর্যে। অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে বর্ষার কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বর্ষাকে মোহনীয় করেন কবিগুরু তাঁর কাব্যসুধায়। তাঁর হাত ধরেই কবিতার মাধ্যমে বর্ষা যেন পূর্ণতা পেয়েছে। তাঁর কবিতায় বর্ষার বিচিত্র রূপ প্রকাশ পায় বর্ষা বন্দনা রূপে। রবীন্দ্রনাথের 'আষাঢ়', 'সোনার তরী', 'বাঁশি'সহ বহু কবিতায় বর্ষা এসেছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। রবীন্দ্রনাথের বহু জনপ্রিয় কবিতার মধ্যে অন্যতম 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', যা বর্ষার দিনে কবি মনকে সিক্ত করে অতীত রোমন্থনে। তাই বুঝি বৃষ্টি এলেই দুরন্ত শৈশব তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, আর কবি আক্রান্ত হন নষ্টালজিয়ায়; তখনই তাঁর কবিতায় ঝরে পড়ে স্মৃতিকাতরতা– 'কবে বৃষ্টি পড়েছিল, বান এলো যে কোথা/শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো কবেকার সে কথা।/সে

দিনও কি এমনিতরো মেঘের ঘনঘটা/থেকে থেকে বাজ বিজুলি দিছিল কি হানা।'

কবিগুরু 'সোনার তরী' কবিতায় এঁকেছেন বর্ষার চিত্র। তিনি লিখেছেন– 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।/ কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।/ রাশি রাশি ভারা ভারা,/ ধান কাটা হলো সারা,/ ভরা নদী ক্ষুরধারা,/ খরপরশা/ কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা।'

তিনি বর্ষায় কখনো খুঁজেছেন গভীরতা, কখনো রোমান্টিকতা। কোথাওবা তিনি বর্ষার প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বৃষ্টিধৌত প্রকৃতির রূপে বিমোহিত হয়ে গান লিখেন– 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান/ আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান।' প্রেমিক তখন ছুটে যায় কবিগুরুর নীপবনে। 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে এসো করো স্নান নবধারাজলে'–এ গানটিতে বর্ষার নবধারাকে আহ্বান করা হয়েছে। আবার বরষার পরশেই গাই– 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে/ পাগল আমার মন জেগে ওঠে...'। বরষা নিয়ে, মেঘ নিয়ে এমন অসংখ্য গান লিখেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর গীতবিতানের পাতায় পাতায় বর্ষা আসে সৌরভে, বর্ষা আসে বিরহে। 'আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে/ জানি নে জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না...' রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় এ গানটি প্রেমিকের মন উচাটন করে তোলে; বিরহী করে তোলে। 'মন মোর মেঘের সঙ্গী/ উড়ে চলে দিগন্তের পানে/ নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সংগীতে/ রিমঝিম রিমঝিম...' এমন গান শুনতে শুনতে আমরা নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলি। বৃষ্টিবিলাস ও বর্ষাবন্দনায় রোমান্টিক বিশ্বকবি বিরহকাতরতায় গেয়ে ওঠেন– 'এমন দিনে তারে বলা যায়/ এমন ঘন ঘোর বরিষায়'।

দ্রোহ আর প্রেমের কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রকৃতির নানামুখী ব্যঞ্জনায় নিজেকে সন্ধান করেছেন। কবিত্বের শিল্প সুন্দর মাধুর্যে কবির কাব্যানুভূতি উৎসারিত হয়েছে। বর্ষার সম্মোহন রূপের প্রভাবে মানবহৃদয়ে বিচ্ছেদের বেদনা ঘনীভূত হয়, সেই দিকটি তিনি কবিতায় উপস্থাপন করেছেন। বিরহ আরও দ্বিগুণ করেছে বাদল দিনের মেঘ। বাদল ধারা প্রিয়ার আগমনী সুরকে বিদায়ি সুরে পরিণত করেছে। বাদল রাতের বর্ষণ সিক্ত রাতের পাখি হয়ে ওঠে কবির বেদনা বিজয়ী চিত্তলোকের চিত্রল প্রতীক। চক্রবাক গ্রন্থের 'বাদল রাতের পাখী' কবিতায় তাঁর অভিব্যক্তি – 'বাদল রাতের পাখি/ উড়ে চল যেথা আজো ঝরে জল, নাহিক ফুলের ফাঁকি।'

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতার মাধ্যমে বাদল রাতের পাখিকে বন্ধু ভেবে আর বিরহের সঙ্গে নিজের বিরহ একাকার করতে চেয়েছেন। তিনি বর্ষাকে ভেবেছেন তাঁর দুঃখ-যাতনার সারথি হিসেবে। 'ইন্দ্র পতন' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন– 'তখনো অস্ত যায়নি সূর্য, সহসা হইল শুরু/ অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরুগুরু গুরুগুরু!/ আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন ইন্দ্রের আগমনী?/ শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃত্তহিত-ধ্বনি।/ বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,/ সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে।'

'বর্ষার বিদায়' কবিতায় কবি নজরুল ইসলামের মনের আকুতি ঝরে পড়ে– 'যেথা যাও তব মুখর পায়ের বরষা নূপুর খুলি/ চলিতে চলিতে চমকে ওঠনা কবরী ওঠে না দুলি/ যেথা রবে তুমি ধ্যানমগ্ন তাপসিদী অচপল/ তোমায় আশায় কাঁদিবে ধরায়, তেমনি ফটিক জল'। কবি বর্ষার নির্জনতায় প্রেমের প্রকৃত মূর্তি গড়েন। নজরুল গীতিতে বর্ষার উপস্থিতি বৈচিত্র্যময়। নজরুল ইসলাম বর্ষার বিদায় মুহূর্তে ব্যথিত হয়েছেন। তাঁর গানের কথায়– 'অঝোর ধারায় বর্ষা ঝরে সঘন তিমির রাতে।/ নিদ্রা নাহি তোমার চাহি আমার নয়ন-পাতে/ ভেজা মাটির গন্ধ সনে/ তোমার স্মৃতি আনে মনে,/ বাদলী হাওয়ায় লুটিয়ে কাঁদে আঁধার আঙিনাতে'। আবার কবি প্রিয়াকে বাদল দিনে বলেন, 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে/ বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে॥/ ভুলিও স্মৃতি মম, নিশীথ-স্বপন সম/ আঁচলের গাঁথা মালা ফেলিও পথ 'পরে॥' নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান পাঠে মনে হয়, বর্ষা ঋতু হচ্ছে যেন বিরহের ঋতু।

রূপসি বাংলার নির্জনতম ও শুদ্ধতম কবি জীবনানন্দ দাশ 'শ্রাবণরাত' কবিতায় মনের উত্তাপ, উচ্ছলতা আর চারপাশের নীরবতাকে বর্ণনা করেন– 'শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাতে/ ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙে যায়/ কোথায় দূর বঙ্গোপসাগরের শব্দ শুনে?/ বর্ষণ অনেকক্ষণ হয়ে থেমে গেছে;/ যতদূর চোখ যায় কালো আকাশ/ মাটির শেষ তরঙ্গকে কোলে ক'রে চুপ করে রয়েছে যেন;/ নিস্তব্ধ হয়ে দূর উপসাগরের ধ্বনি শুনছে।/ মনে হয়/ কারা যেন বড়ো বড়ো কপাট খুলছে,/ বন্ধ ক'রে ফেলেছে আবার;/ কোন্ দূর নীরব আকাশরেখার সীমানায়।'

'মুসলিম রেনেসাঁর কবি' ফররুখ আহমদ অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণায় ইসলামি ভাবধারার বাহক হলেও তাঁর কবিতায়ও বর্ষার দোল লেগেছে। বৃষ্টির ছন্দ তাঁকে বিমুগ্ধ করেছে। মনে আনন্দের ঢেউ খেলিয়েছে। তিনি আনন্দে তবলার ছন্দের মতো শিশুতোষ কাব্য 'বৃষ্টির গান' কবিতায় গেঁথেছেন– 'বৃষ্টি এলো কাশবনে/ জাগলো সাড়া ঘাসবনে/ বকের সারি কোথায় রে/ লুকিয়ে গেলো বাঁশবনে।/ নদীতে নাই খেয়া যে/ ডাকলো দূরে দেয়া যে/ কোন সে বনের আড়ালে/ ফুটলো আবার কেয়া যে'।

পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন বর্ষা নিয়ে অনবদ্য কবিতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অনবদ্য কবিতাটি হলো 'পল্লী-বর্ষা'। এ কবিতায় কবি বর্ষার অবিশ্রান্ত বর্ষণমুখর গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে যে আড্ডার আসর বসে, ফাঁকে ফাঁকে পল্লিবাংলার শ্রমজীবী মানুষের অসমাপ্ত কাজগুলোও যে আড্ডার ছলে সারা হয়ে যায় এবং একই সঙ্গে কেচ্ছাকাহিনি শোনার যে লোকায়ত চিত্র, তা তুলে ধরেছেন– 'গাঁয়ের চাষীরা মিলিয়াছে আসি মোড়লের দলিজায়,/ গল্পে গানে কি জাগাইতে চাহে আজিকার দিনটায়!/ কেউ বসে বসে কাখারী চাঁচিছে, কেউ পাকাইছে রসি;/ কেউবা নতুন দোয়াড়ীর গায়ে চাকা বাঁধে কসি কসি।/ মাঝখানে বসে গাঁয়ের বৃদ্ধ, করুণ ভাটীর সুরে/ আমির সাধুর কাহিনী কহিছে সারাটি দলিজা জুড়ে।/বাহিরে নাচিছে ঝর ঝর জল, গুরু গুরু মেঘ ডাকে,/ এসবের মাঝে রূপ-কথা যেন আর রূপ-কথা আঁকে'। কবিতার সম্পূর্ণ অংশেই তিনি টেনেছেন বর্ষায় পল্লিগাঁয়ের প্রকৃতির বর্ণনায়।

কবি আহসান হাবীব বৃষ্টিকে ঘিরে আমাদের দারিদ্র্য, হতাশা আর স্বপ্নকে বুনেছেন নিজস্ব স্বপ্নময়তাকে অবলম্বন করে। তিনি যেন প্রবল কোনো ঘোরের মধ্যে থেকে পার করছেন অপেক্ষার নিরন্তর প্রহর। তাঁর 'রেনকোট' কবিতায় লিখেছেন– 'পঁচিশটি বর্ষা তো পেরিয়ে এলাম/ দেখে এলাম/ কত অন্ধকার অরণ্যশীর্ষ/ কালো মেঘের অন্ধকারে ছাওয়া,/ দেখলাম/ কত ঝরঝর বর্ষা/ আর কত

নিঃসঙ্গ জানালার/ ইতিহাস পড়লাম/ আমার নির্বিকার জানালায়'। কবি একটা রেইনকোটের অভাব অনুভব করেছেন। পঁচিশ বছর কেটে গেছে বর্ষা দেখতে দেখতে, তবু আজও একটা রেইনকোট তার হয়নি। জানালায় নির্বিকার বসে বসে নিঃসঙ্গতাকে পুষেছেন। নিঃসঙ্গ জানালার ইতিহাস পড়েছেন।

স্বাধীনতার কবি শামসুর রাহমান বৃষ্টি বন্দনায় 'অনাবৃষ্টি' কবিতায় লিখেছেন– 'টেবিলে রয়েছি ঝুঁকে, আমিও চাষীর মতো বড়/ ব্যগ্র হয়ে চেয়ে আছি খাতার পাতায়,/ যদি জড়ো হয় মেঘ, যদি ঝরে ফুল বৃষ্টি/ অলস পেন্সিল হাতে বকমার্কা।/ পাতাজুড়ে আকাশের নীল'।

কবি আল মাহমুদ 'আষাঢ়ের রাতে' কবিতায় লিখেন– 'কেন যে আবিল গন্ধে ভরে ওঠে আমার নিঃশ্বাস।/ এই রাত, এই হাওয়া, নীলিমার নক্ষত্রনিচয় আর/ আত্মীয় চাঁদের পিঠ, সবি যেন আচ্ছন্ন ধোঁয়ায়,/ যেন সবি প্রায়ান্ধ চোখের কাছে অস্পষ্ট সুদূর।/ শুধু দিগন্তবিস্তৃত বৃষ্টি ঝরে যায়, শেওলাপিছল/ আমাদের গরীয়ান গ্রহটির গায়'।

রফিক আজাদ তাঁর 'ময়ূর আনন্দে মাতো' কবিতাটিতে বর্ষার আহ্বান করেছেন। বর্ষার রূপ পূর্ণতা দিতে বর্ষার অপার যে আনন্দ সেই আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন– 'বর্ষায় বর্ষণ চাই মননে-মেধায়/ শস্যের প্রান্তরে আর প্রতি ঘরে ঘরে, জীবনে-জীবন চাই যুগলে-যুগলে/ বর্ষার ধারাপাত অপার বর্ষণে এই মাঙ্গলিক ময়ূর-আনন্দে/ মাতো কৃষি সভ্যতার সকল সন্তান'।

কবি নির্মলেন্দু গুণ 'বর্ষার সঙ্গে আমার সম্পর্ক' কবিতার মধ্য দিয়ে বর্ষার সঙ্গে তাঁর এক মধুর সম্পর্ক তুলে ধরে বর্ষাকে তিনি ঋতুর রানি বলে আখ্যায়িত করেছেন– 'ভাগ্য ভালো, মনুষ্য-বিবাহপ্রথা বর্ষা জানে না।/ সে ভালোবাসে উন্মুক্ত বিহার, গগনে গরজে, তবে সিঁধুরে মেঘের প্রতি তার টান আছে, তাই/ আমি তাকে পরিয়েছি বজ্রচেরা মেঘের সিঁধুর'।

কবি মহাদেব সাহাও বর্ষা নিয়ে বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কাছে তো বর্ষা হচ্ছে জীবনের প্রথম আনন্দ। তিনি বর্ষাকে তাঁর জন্মঋতু হিসেবে কবিতায় আখ্যায়িত করেছেন। তিনি 'বর্ষা' কবিতাটিতে তুলে ধরেছেন– 'বর্ষা হচ্ছে জীবনের প্রথম আনন্দ, আজো আমি/ বর্ষায় উন্মাদ/ আজো আমি বর্ষামত্ত ঘোরলাগা পল্লীর বালক/ বর্ষায় আবার আমি ফিরে পাই ত্বক ও জিহ্বার স্বাদ'।

কবি আবুল হোসেন 'বর্ষার দিনে' কবিতায় লিখেছেন– 'সমস্ত দিন শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনি,/ মৌলালীর মোড়ে কারখানার টিনের ছাদে/ নরম পীচের ওপরে শান বাঁধানো হাঁটা পথে/ অবিশ্রাম ঝনঝন্ ধ্বনি ওঠে'। কবি সারাদিন শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শোনেন। এটা কবির কথা হলেও আমাদের সবার জন্য প্রযোজ্য।

কবি শহীদ কাদরী তাঁর 'বৃষ্টি, বৃষ্টি: উত্তরাধিকার' কবিতায় বলেছেন, 'এইক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু, বর্ষায়, বিদ্যুতে/ নগ্নপায়ে ছেঁড়া পাৎলুনে একাকী/ হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে/ ঝকঝকে, সদ্য, নতুন নৌকোর মতো, একমাত্র আমি'। এখানে কবি বর্ষায় খালিপায়ে একাকী হেঁটেছেন, যেখানে কোনো জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কবিতায় লিখেছেন– 'মেঘ থেকে বৃষ্টির দু' ফোঁটা! উড়ে গেলে তুমি!/ কোথাও কি খাদ্য ে চাখে পড়েছে হঠাৎ? বৃষ্টির বিশুদ্ধ জল/ তবে পড়ে আজও পৃথিবীতে? আমিও তো উড়ে যেতে চাই/ বৃষ্টিজলে মানুষের যাপিত সংসারে'। এখানে কবি বৃষ্টিজলে মানুষের যাপিত সংসারে উড়ে যেতে চেয়েছেন। বৃষ্টির জলকে কবি বিশুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

কবি আসাদ চৌধুরী 'প্রথম কবি তুমি প্রথম বিদ্রোহী' কবিতায় লিখেছেন– 'টেবিলে মোমবাতি কোমল কাঁপা আলো/ বাহিরে বৃষ্টির সুরেলা রিমঝিম-/ সস্মৃতির জানালায় তোমার মৃদু টোকা'। কবির কল্পনায় কেবল বৃষ্টির আনাগোনা। স্মৃতির জানালায় বৃষ্টির টোকা।

কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা তাঁর 'বৃষ্টি পড়ে' কবিতায় বৃষ্টিকে নানা আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন– 'বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে/ মনে মনে বৃষ্টি পড়ে/ বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে/ বনে বনে বৃষ্টি পড়ে/ মনের ঘরে চরের বনে/ নিখিল নিঝুম গাও গেরামে/ বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে/ বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে'। কবির দৃষ্টিতে মনে মনে, বনে বনে– সর্বত্রই বৃষ্টি পড়ে।

কবি হাসান হাফিজ তাঁর 'বর্ষাভেজা পদাবলীতে' বর্ষাকে আনন্দ-বেদনা উভয়রূপেই কল্পনা করেছেন– 'শ্রাবণে বিরহ শুধু নয়, আগুনও রয়েছে/ সেই তাপে শুদ্ধ হবে অসবর্ণ মিল পিপাসা'।

মেঘ-বৃষ্টিকে ভয় এবং মেঘ-মুক্ততাকে সাহস, ঝড়কে দ্রোহ এবং ধ্বংসের উভয় উপমায় ব্যবহার করা যায়, অন্য কোনো প্রাকৃতিক ঘটনাকে বোধহয় এতরূপে উপস্থাপন করা যায় না বিধায় কবিতায়ও মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ের আধিক্য। বর্ষার প্রভাবে মানুষ ভাবুক হয়ে ওঠে। সৃষ্টি হতে থাকে বর্ষার পদাবলি। আলোচনার বাইরে আধুনিক যুগের আরও অনেক কবি বর্ষার বন্দনায় কাব্য স্তুতি করেছেন। কত কবির কবিতা আলোচনায় আনা যায়নি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তাদের কাব্যেও পাওয়া যেত, বর্ষার অপার সৌন্দর্যের কাব্যিক সরস বর্ণনা। সংগত কারণেই সে প্রচেষ্টা করা যায়নি বলেই কবি ও পাঠক চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনীয়।

ঐশ্বর্যের ঋতু, নব জলধারার ঋতু, সমৃদ্ধির ঋতু বর্ষা। গ্রীষ্মের দাবদাহে মানুষের মন যখন অস্থির হয়ে ওঠে, মানুষ বর্ষা বন্দনায় ব্যাকুল হয়। যেন 'কখন আসবে বর্ষা কখন জুড়াবে প্রাণ' কাব্যিক ব্যঞ্জনার মতো। তপ্ত গ্রীষ্মের প্রহর শেষে ধরণী যখন উত্তপ্ত, এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য হাহাকার ধ্বনিত হয়; তখন বর্ষাকে আহ্বান জানানো হয়– 'আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে রে তুই, আল্লাহ মেঘ দে' গানের কথার মতো আকুতিতে। বর্ষার নতুন জল পেয়ে জেগে ওঠে প্রকৃতি ও মানুষ। বর্ষা সকল প্রকার জরাজীর্ণতাকে ধুয়ে-মুছে পবিত্র করে তোলে। সবুজে সবুজে ভরিয়ে দেয় আমাদের প্রতিবেশ। যুগ যুগ ধরে বর্ষা আর বৃষ্টিবিলাসে গা ভাসিয়ে বাঙালি বরণ করেছে বর্ষাকে। বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ, প্রকৃতির রূপ, বৃষ্টির পতনে আশ্চর্য সংগীত ধ্বনিত হয় বর্ষামঙ্গলে। বর্ষায় কবির কলমে কবিতা হয়, লেখকের গল্প হয় আবার গায়কের কণ্ঠে গানও হয়। বর্ষা শুধু মানুষ ও প্রকৃতিকেই ঋদ্ধ করে না, আমাদের সাহিত্যকেও করেছে সমৃদ্ধ। বর্ষার সাহিত্য বর্ষার মতোই হোক আরও প্রাণবন্ত ও সজীব। মানুষের সহজাত জীবনাচার এবং জীবনবোধের ওপর বর্ষার নিবিড় প্রভাবের কারণে বাংলা কবিতায় বর্ষার বহুরূপী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্ষার পদাবলি হোক আরও ঋদ্ধ, চিত্তাকর্ষক, সমুজ্জ্বল ও ব্যঞ্জনাময়।

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ: সাংবাদিক, সংগঠক, লেখক ও গবেষক, varnobanondo@gmail.com

আগুনের পরশমণি চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত সমাজব্যবস্থা

বিনয় দত্ত

এক.

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ; যিনি উপন্যাস, ছোটোগল্প, চলচ্চিত্র, গান, চিত্রনাট্য সব জায়গায় সমানভাবে অবদান রেখেছেন। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *নন্দিত নরকে*। এই উপন্যাসে তিনি যে মধ্যবিত্ত সমাজব্যবস্থার গল্প বলেছেন তা সর্বজনস্বীকৃত এবং সমাদৃত। এছাড়া *শঙ্খনীল কারাগার* বা ধারাবাহিক নাটক *আজ রবিবার* বা *কোথাও কেউ নেই* সব জায়গায় তিনি মধ্যবিত্ত সমাজের গল্প বুনেছেন। দেখিয়েছেন সংকটগুলো কোথায়? সেই বিবেচনায় *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্রটিও এই জীবন ব্যবস্থায় ঠাসা।

আগুনের পরশমণি হুমায়ূন আহমেদের প্রথম চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের আঙ্গিক বিচার বা বিশ্লেষণে তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে *আগুনের পরশমণি* মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস হিসেবে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। পাঠক, দর্শক, আলোচক বা সমালোচক হিসেবে বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে লেখক এবং পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি জানা জরুরি।

হুমায়ূন আহমেদের আত্মজৈবনিক রচনাসমগ্র, সেখানে তিনি বলেছেন, 'সিনেমা করার জন্য *আগুনের পরশমণি* বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ হলো, এটি আমার অতি প্রিয় একটি গল্প। অপ্রধান কিছু কারণ আছে যেমন– এটি মহান মুক্তিযুদ্ধের গল্প। পুরো গল্পটি একটা সেটে বলা হয়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের একতলা একটা বাড়িতে কয়েকদিনের ঘটনা। অল্প কিছু পাত্রপাত্রী নিয়ে কাজ। বিশাল আয়োজনের কিছু দরকার নেই।'

যে মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য হুমায়ূন এই গল্প বেছে নিয়েছেন সেই মধ্যবিত্ত পরিবার নিয়েই এই লেখা। উপন্যাস *আগুনের পরশমণিতে* গল্পের শুরু হুট করে। অস্থিরতা-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে। মধ্যবিত্ত অবকাঠামো ঠিক রেখে।

'সারাটা সকাল উৎকণ্ঠার ভেতর কাটল। উৎকণ্ঠা এবং চাপা উদ্বেগ। মতিন সাহেব অস্থির হয়ে পড়লেন। গেটে সামান্য শব্দ হতেই কান খাড়া করে ফেলেন, সরু গলায় বলেন– বিন্তি দেখতো কেউ এসেছে কি না।'

হুমায়ূনের সাহিত্য পাঠ করলে এই ধরন সম্পর্কে জানা যায়। আয়েশি ঢঙে গল্প বলে পাঠক আটকানোর ক্ষমতা হুমায়ূনের প্রবল। সেই প্রবল ক্ষমতায় মধ্যবিত্ত অবকাঠামো দারুণ অনুষঙ্গও বটে। হুমায়ূন সবসময় মধ্যবিত্তের গল্পই বলেন। তাঁর গল্প, উপন্যাস, চলচ্চিত্রে এর স্বাক্ষর মেলে। তাঁর প্রথম উপন্যাস *নন্দিত নরকে* (১৯৭২)। সেই উপন্যাসের প্রেক্ষাপটও মধ্যবিত্ত পরিবারকে ঘিরেই।

হুমায়ূন *আগুনের পরশমণি* (১৯৯৪) চলচ্চিত্রে যে মধ্যবিত্তের গল্প বলেছেন, সেই মধ্যবিত্তের জন্ম আসলে কোথায়? এর উত্তর দিয়েছেন জ্ঞানতাপস অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশের 'মধ্যবিত্ত' শুদ্ধ পাকিস্তান আমলে জন্মায় নাই। তাহারা জন্মাইয়াছেন ব্রিটিশ রাজত্বের ছায়াতলে।"

প্রশ্ন হলো, হুমায়ূন কেন *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেন? হুমায়ূন নিজেও কিন্তু মধ্যবিত্তের সন্তান। মধ্যবিত্ত সম্পর্কে তাঁর জানাশোনা ভালো। বোঝাপড়া ভালো। *আগুনের পরশমণি* তাঁর যেমন পছন্দের আবার তিনি এক সেটে গল্প বলতে পারবেন– এইটাও তাঁর পছন্দের।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গোটা গল্পটাই মধ্যবিত্ত একটা পরিবারের। সেই মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলমের আগমন। হুমায়ূন যেমন বলেন, 'পুরো গল্পটি একটা সেটে বলা হয়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের একতলা একটা বাড়িতে কয়েকদিনের ঘটনা।'

আগুনের পরশমণি চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্তের ব্যঙ্গবিদ্রূপ না থাকলেও মধ্যবিত্তের সংকট দারুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, নিগূঢ় সত্য সামনে এসে ধরা দিয়েছে। সেই সংকটের জালে আটকে পড়া মধ্যবিত্ত যেন প্রতিদিন আশায় বাঁচে। সেই আশা তাদের বাঁচিয়ে রাখে। তাই বলা হয়, মধ্যবিত্তের হারানোর কিছু নেই।

আগুনের পরশমণি চলচ্চিত্রের মতিন সাহেব যে ধরনের মধ্যবিত্ত তারও আসলে হারানোর কিছু নেই। ১৯৭১ সালে দেশজুড়ে পাকিস্তানিদের অত্যাচার শুরু হয়েছে। বাঙালি জীবন অবরুদ্ধ। সেই অবরুদ্ধ জীবনে মতিন সাহেবের পরিবারও অবরুদ্ধ। তারা প্রতিদিন বাঁচতে চায়, কিন্তু বাঁচতে গিয়ে মরে যায়। এই মরে যাওয়া কিন্তু প্রাণ হারিয়ে ফেলা নয়। জীবন থেকে আশা ফুরিয়ে যাওয়া। নতুন স্বপ্ন হারিয়ে যাওয়া। তাদের যাপিত জীবনই বলে দেয় তারা আসলে রূঢ় বাস্তবতায় মৃত। সত্যের কাছে মৃত। সত্য তাদের প্রতিদিন গ্রাস করে নিচ্ছে। তারা বেঁচে আছে ঠিকই কিন্তু বেঁচে না থাকার মতোই।

মতিন সাহেবের বড়ো মেয়ে রাত্রি যখন ঘুমাতে গিয়ে অস্থিরতায় উঠে পড়ে তখন মতিন সাহেব তাকে বাঁচার আশা দেয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার আশা দেয়। স্বাধীন দেশে রাত্রির বিয়ে হবে ধুমধাম করে সেই আশা দেয়। গেরিলা বাহিনী জীবন তুচ্ছ করে যুদ্ধে নেমেছে সেই তুলনায় মতিন সাহেবের পরিবার ভালো আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে– এই যে রাত্রিকে মতিন সাহেব অন্যের তুলনায় ভালো থাকার গল্প শোনাচ্ছেন, আশা জাগাচ্ছেন, সাহস জোগাচ্ছেন– এইটাই মধ্যবিত্তের চরিত্র।

অদেখা সত্যের কাছে বেঁচে থাকার স্বপ্ন বন্ধক রাখা, আশার বীজ বপন করা, সেই আশা নিয়ে প্রতিদিন বেঁচে থাকা, এই চক্রে মধ্যবিত্তের জীবন আটকা। এই চরিত্র প্রবল হুমায়ূনের গল্প-উপন্যাস-চলচ্চিত্রে। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের দারুণ একটা সংকট হুমায়ূন ফ্রেমবন্দি করেছেন।

দুই.

মধ্যবিত্তের আরেক সংকট হলো স্পষ্ট করে বলতে না পারা। মতিন সাহেব অফিসে যাবেন। যাওয়ার পথে তিনি সুরমাকে বলছেন, আজ তার কাছে একটা ছেলে আসবেন। কয়েকদিন থাকবেন। সুরমা বলেন, এই সময় ছেলে আসবে মানে? মতিন সাহেব বলেন, চাকরির খোঁজে আসবে। সুরমা বলেন, এই সময় চাকরি খোঁজে মানে?

মতিন সাহেব এবং সুরমার কথোপকথন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হুমায়ূন এক ফ্রেমে তাদের দুইজনকে পাশাপাশি রেখে কথোপকথন চালাতে বলেন। মজার বিষয় হলো, সুরমা গৃহকর্ত্রী হিসেবে সবসময় জিজ্ঞাসার ধরনে জানতে চান আর মতিন সাহেব সব জানার পরও সত্য বলতে পারেন না। সত্যটা গোপন করে যান। যেন সত্য বললেই তিনি শাস্তি পাবেন। শেষমেশ অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। ছোটো ছোটো দৃশ্য কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবার বোঝার জন্য দারুণ বিস্তৃতি।

সাধারণ উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত অনেক বেশি স্পষ্টবাদী, সুদৃঢ় বা তীক্ষ্ণ। মধ্যবিত্ত কিন্তু স্পষ্টবাদী না, কেমন যেন মিনমিনে স্বভাবের। হুমায়ূনের গল্প-উপন্যাস-চলচ্চিত্রে এর প্রচ্ছন্ন ছাপ পাওয়া যায়। আরেকটা দৃশ্যে দেখা যায়, মতিন সাহেবের অফিসে তার কলিগ রফিক সাহেব মতিন সাহেবের সাথে কথা বলতে আসেন। রফিক সাহেব দেশের খবর জানতে চান। মতিন সাহেব এড়িয়ে যান। অফিসে আসার পথে দুটো লাশ দেখেছেন তাতে মন বিষণ্ন। দেশ ঠিক করতে পাকিস্তানিদের এই কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক বলছেন রফিক সাহেব।

রফিক সাহেব যে ভুল বলছেন বা অপছন্দের কথা বলছেন বা বাঙালি হয়ে পাকিস্তানিদের পক্ষ নিচ্ছেন তা মতিন সাহেবের পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু তিনি মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছেন না। মনে মনে রাগে ফুঁসছেন। হাত দিয়ে ঢেকে তিনি রফিক সাহেবের উদ্দেশে লিখেছেন– 'you stupid, গাধা, হারামজাদা'।

অথচ এই কথাগুলো তিনি লিখলেন ঠিকই কিন্তু বলতে পারলেন না। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের পক্ষ নেওয়া কোনো বাঙালিই পছন্দ করবে না, তা সহ্য করার মতো নয়। অফিস কলিগ হিসেবে মতিন সাহেবও বিষয়টা পছন্দ করছেন না। কিন্তু তিনি রফিক সাহেবকে নিজের রাগের কথাও বলতে পারছেন না। মধ্যবিত্ত বাঙালির এই গুণ অসাধারণ, হুমায়ূন তা তুলে ধরেছেনও বেশ নান্দনিকভাবে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের আরেকটি মজার গুণ হলো, শুরুতে যাকে অপছন্দ করবে পরে তার জন্য সবচেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠবে। *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্রে এই প্রবণতা খুব ভালো করে লক্ষ করা যায়।

মতিন সাহেবের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম এসেছেন। মতিন সাহেবের স্ত্রী সুরমা বদিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। মেনে না নেওয়াই স্বাভাবিক। বাড়িতে একটা যুবতী মেয়ে আছে এই সময় কেউই বাইরের লোক আশা করবে না। সময়টাই এমন।

বদি খুব স্বাভাবিকভাবে মতিন সাহেবের বাড়িতে প্রবেশ করেন। নিজের থাকার জায়গা দেখিয়ে দিতে বলেন। বদির আগমন পছন্দের না হলেও বদির জন্য সুরমা ঠিকই ঘর পরিষ্কার করেন। রাত্রি যখন সুরমাকে ঘর পরিষ্কারের বিষয়ে জানতে চায় তখন সুরমা ক্ষেপে যান। রেগে গিয়ে বলেন, এইটা কি কোনো হোটেল, যার ইচ্ছা থাকবে।

বিষয়টা খুবই সরল। মধ্যবিত্ত পরিবারে এই ধরনের বিষয় প্রতিনিয়ত দেখা যায়। অপছন্দের কেউ বাড়িতে এলেই তাকে তো হুট করে বের হতে বলা যায় না। তার আগমনের রাগ তখন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ওপর গিয়ে পড়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারে এইটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। শুধু তাই নয়, সেই অপছন্দের লোক বাড়িতে থাকা শুরু করলে তখন তার ওপর মায়া বাড়তে থাকে। তার সব অস্বাভাবিকতাই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক মনে হয়। যেমনটা বদির ক্ষেত্রে হয়েছে।

বদির সাথে ভেতরের বারান্দায় বসে অপলা গল্প করছে। রাত্রি আর সুরমা রুমে আছেন। সুরমা সেলাই করছেন। রাত্রি সুরমাকে বলছেন, অপলা কেন অপরিচিত লোকটার সাথে এত মাখামাখি করছে? সুরমা বলেন, কথা বলার মানুষ পায় না...। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে সুরমার অপরিচিত বদিউল আলমের ওপর মায়া

জন্মানো শুরু হয়েছে। না হয় তিনি অপলার সাথে বদির গল্প করাটা সহজ-স্বাভাবিকভাবে দেখতেন না। মধ্যবিত্ত পরিবার এমনই। শুরুতে কোনো বিষয়ের প্রতি তীব্র বিরক্তি থাকলেও ধীরে ধীরে তার প্রতি মায়া জন্মানো শুরু হয়।

তিন.

মধ্যবিত্তের রক্ষণশীলতা নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা আছে। হুমায়ূনের *আগুনের পরশমণি* মধ্যবিত্তের রক্ষণশীলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মধ্যবিত্তের রক্ষণশীলতা বা মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ইমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, বাঙালি মধ্যবিত্ত সব সময়েই হিসাব করে চলে, লাভের সুযোগ দেখলে উৎফুল্ল হয়, বিপদের আভাস অনুমান করা মাত্র নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

এর প্রতিফলন *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্রেও রয়েছে। বদিকে আশ্রয় দেওয়া কিন্তু বিপজ্জনক। তাই সুরমা চাইছিলেন কোনোভাবে যেন বদিকে অন্যত্র পার করে দেওয়া যায়। কিন্তু বদি যেহেতু এই ঠিকানা তার দলকে দিয়ে এসেছে তাই সে একরকম জোর করেই এই বাড়িতে খুঁটি গাড়ে।

হুমায়ূনের *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্রে আমরা যে মধ্যবিত্ত দেখি সেই মধ্যবিত্ত কিন্তু সাংস্কৃতিক। গোটা চলচ্চিত্রে রাত্রিকে সবসময় বই পড়তে দেখা যায়। রাত্রি গান পাগল মানুষ। মনের আনন্দে গলা খুলে গান গাইতে পছন্দ করে। কিন্তু পাকিস্তানিদের এই শাসনকালে তার সমস্যা হচ্ছে। তারপরও তারা পুরো পরিবার একসাথে বসে গান উপভোগ করছে। চাঁদ দেখে 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো' গেয়ে ওঠা, আনন্দে-খুশিতে 'নেশা লাগিলো রে বাঁকা দুই নয়নে নেশা লাগিলো রে' গেয়ে ওঠাই মধ্যবিত্তের ধর্ম। মধ্যবিত্তের যাপিত রীতিতে গান দারুণ এক অনুষঙ্গ।

সামাজিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির রক্ষণশীলতা যেমন আছে দ্বিচারিতাও তেমন আছে। এই শ্রেণির মধ্যবিত্ত আন্দোলন-সংগ্রামেও অংশ নেয় আর প্রবল রক্ষণশীলতাও ধরে রাখে। যদিও *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্রে আন্দোলন বলতে মিছিল, মিটিং দেখানো হয়নি।

মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণেরা ক্র্যাক প্লাটুনে অংশ নেয়। তারাই ঢাকা শহরে সক্রিয় আক্রমণ পরিচালনা করে। বিদ্যুৎ ভবন উড়িয়ে দেয়। হুটহাট অপারেশন পরিচালনা করে। পেট্রোল পাম্প উড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে মাঝপথে তাদের গাড়ি বন্ধ হয়ে গেলে তারা পাকিস্তানিদের সাথে মুখোমুখি বন্দুক যুদ্ধে নেমে পড়ে। তাদের আলাদাভাবে চেনা যায়। এই চরিত্রগুলোই মধ্যবিত্ত থেকে উঠে আসা।

আন্দোলন ফলপ্রসূ হওয়ার পেছনেও কিন্তু মধ্যবিত্তের রক্ষণশীল মানসিকতা কাজ করেছে। *আগুনের পরশমণি* গোটা চলচ্চিত্রে হুমায়ূন বিভিন্নভাবে রক্ষণশীল মধ্যবিত্তকে তুলে ধরেছেন। মতিন সাহেব নিজের বাড়িতে একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়েছেন কারণ তিনি চান দেশ স্বাধীন হোক। মুক্তি পাক বাঙালি। স্বাধীন দেশের যাত্রাপথে নিজেও অংশীদার হিসেবে থাকতে চেয়েছেন। ঘরে অশান্তি হলেও তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। গেরিলা যোদ্ধা বদিকে আশ্রয় দিয়েছেন। আবার সেই মতিন সাহেবই বাসায় পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি টাঙিয়েছেন। কাজটা তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও করেছেন, নিজের মনের বিরুদ্ধে করেছেন কারণ, প্রাথমিক সংকট যেন তিনি পার করতে পারেন। ঘরে যদি হুট করে পাকিস্তানি মিলিটারি আসে তারা যেন বুঝতে পারে মতিন সাহেব পাকিস্তানপ্রেমী। এই হচ্ছে মধ্যবিত্তের রক্ষণশীলতা, সীমাবদ্ধতা।

আরেকটা দৃশ্যে মতিন সাহেব বাড়ি ফিরছেন। পাকিস্তানি মিলিটারি রিকশাওয়ালাকে ধরে বেধড়ক মার দিলো। এতে মতিন সাহেবের মন কেঁদে উঠল কিন্তু তিনি বললেন না বা বলতে পারলেন না। কারণ বন্দুকের সামনে তার প্রাণ চলে যাবে। মিলিটারি তার কাছে পরিচয়পত্র চাইলে তিনি বের করে দিলেন। মিলিটারি চলে গেল। মতিন সাহেব আহত রিকশাওয়ালার পাশে বাসায় নেওয়ার জন্য যে কলা কিনেছিলেন তা রেখে দিলেন। গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। এই আকুতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার অনেক কিছুই করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু কিছুই করতে তিনি পারছেন না। রিকশাওয়ালাকে আহত অবস্থায় ফেলে যেতে হচ্ছে।

মধ্যবিত্তের প্রবল আবেগ। এই বিষয়টি হুমায়ূন জানেন। তাই তিনি আবেগমাখা সেই চিঠি শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসলেন। বদি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মতিন সাহেবের বাসায় পড়ে আছেন। অপারেশনে যাওয়ার আগে মা আর বোনের সাথে দেখা করেছিল। বোন তখন তাকে একটা চিঠি দেয়। বদি বুকপকেটে সেই চিঠি আগলে রাখে।

বদি চিঠি পড়তে দিলেন অপলাকে। যে মেয়েটা বদির সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল। বন্ধুর মতো। অপলা চিঠিটা পড়ল আর হু হু করে কেঁদে উঠল। চিঠির আবেগ শুধু অপলাকে নয়, দর্শকদেরও কাঁদিয়ে তুলল।

পুরো পরিবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে বদিকে সুস্থ করে তুলতে। কিন্তু অদৃষ্ট বদিকে পরপারে নিয়ে যাবেই। এইটা মধ্যবিত্তের অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টের রচয়িতা হুমায়ূন হলেও বাস্তবেও এমনটাই দেখা যায়। সুখের মুহূর্তে প্রিয়জনের বিদায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। বদির বিদায়ের রেশ রয়ে যায় দর্শকদের হৃদয়ে, মতিন সাহেবের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মনে।

চার.

আগুনের পরশমণি চলচ্চিত্রে হুমায়ূন যেভাবে মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র এঁকেছেন বা ধরেছেন তা কি প্রথম? না। পূর্বসূরি লেখক, পরিচালকেরাও কিন্তু একইভাবে মধ্যবিত্তের গল্প বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে হুমায়ূন আহমেদ সবাই মধ্যবিত্তের গল্প বলেছেন। সবাই মধ্যবিত্তকে তাদের লেখনী বা চলচ্চিত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, হুমায়ূন একা ব্যতিক্রম নয়। ব্যতিক্রম হুমায়ূনের গল্প বলার ঢং বা স্বকীয়তা। এই ঢং বা স্বকীয়তা ব্যাকরণ মেনে চলে না, চলে গল্পকথক বা পরিচালকের ইচ্ছায়।

বিনয় দত্ত: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক
benoydutta.writer@gmail.com

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) কার্যক্রম (জুলাই-২০২৫)

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৪ই জুলাই ২০২৫ ঢাকায় 'নোটস অন জুলাই' পোস্টকার্ডের মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিকথা সংগ্রহের কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তাগণ অংশ নেন— পিআইডি

তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'নোটস অন জুলাই' পোস্টকার্ডের মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিকথা সংগ্রহ

'নোটস অন জুলাই' পোস্টকার্ডের মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিকথা সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। এ কার্যক্রমের আওতায় সোমবার (১৪ই জুলাই) কেন্দ্রীয় শহিদমিনার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে ৭০০ জনের স্মৃতিকথা সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর-সংস্থা এবং জেলা তথ্য অফিসসমূহের মাধ্যমে আগামী ৫ই আগস্ট পর্যন্ত 'নোটস অন জুলাই' পোস্টকার্ডের মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিকথা সংগ্রহ কার্যক্রম চলবে। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এই পোস্টকার্ডে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কিত স্মৃতি ও মতামত প্রদান করতে পারবেন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং এই আন্দোলন নিয়ে একাধিক প্রামাণ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র নির্মাণে ভূমিকা পালন করেছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে প্রকাশনা তৈরি এবং প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। ডিএফপি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর ইতোমধ্যে ৯টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে চার বিভাগের (চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর ও খুলনা) আন্দোলনকেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর পৃথক চারটি প্রামাণ্যচিত্র। বাকি পাঁচটি প্রামাণ্যচিত্র হলো: 'শ্রাবণ বিদ্রোহ', 'আঁধার পেরিয়ে', 'একটি স্বপ্নের জন্য', 'গণমুক্তি অনিবার্য' ও 'লেখা আছে অশ্রু জলে'। প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের পাশাপাশি ডিএফপি বেশকিছু প্রকাশনা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের ওপর অঙ্কিত গ্রাফিতি-বিষয়ক সচিত্র অ্যালবাম *৩৬ জুলাই: গ্রাফিতিতে বাংলাদেশ*-এর ১ম ও ২য় খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, ডিএফপি গণ-অভ্যুত্থানের ওপর নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ*, *নবারুণ* ও *বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি*-এর কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে।

চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মরণে নির্মিত 'শ্রাবণ বিদ্রোহ' চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শো আয়োজন করা হয়। এটি জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত হয় এবং পরবর্তীতে দেশব্যাপী জেলা তথ্য অফিসগুলোর মাধ্যমে প্রদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর ইতোমধ্যে ৯টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছে এবং স্মৃতি সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করছে।

অন্যান্য কাজের বিবরণ

১. নতুন মিডিয়া তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ২টি

২. নিরীক্ষাপূর্বক প্রত্যয়নপত্র জারি করা হয়েছে ৭৮টি

৩. ৮ম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন করায় নিউজপ্রিন্ট প্রাপ্যতার প্রত্যয়ন জারি ২৪টি

৪. এবিসি শাখা কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনকৃত সংবাদপত্রের সংখ্যা ৭৬টি এবং

৫. নিরীক্ষার জন্য পরিদর্শন ৭৬টি।

অ্যাডহক প্রকাশনা

১. শ্রাবণ বিদ্রোহের প্রিমিয়ার শো-এর প্রচারণার জন্য ২০০০ কপি পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

২. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদা ও ডিজাইন মোতাবেক ১০টি ভিন্ন ক্যাটাগরির ৪ লক্ষ কপি পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

৩. জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষায় ৭ লক্ষ ২০ হাজার কপি পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

৪. জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে ইংরেজি ভাষায় ২৮০০ কপি পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

জনমিতিক লভ্যাংশে বাংলাদেশ

শারমিন ইসলাম

একটি রাষ্ট্রের যে কয়েকটি মৌলিক উপাদান রয়েছে তার মধ্যে জনসংখ্যা অন্যতম। আর এই জনসংখ্যাই কোনো দেশের জন্য কখনও সম্পদ আবার কোনো দেশের জন্য বোঝা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা না করে বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে প্রযুক্তি ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যা দক্ষ করতে পারলে তা সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় অপুষ্টি, পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব, বেকারত্ব, চিকিৎসাসেবার অপ্রতুলতার মূলে রয়েছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা। আর এসব বিষয়কে সামনে রেখে জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্যাগুলো সকলকে অবহিত করা এবং তা গুরুত্ব সহকারে সমাধানের লক্ষ্যে পালিত হয় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। ১৯৮৭ সালের ১১ই জুলাই তারিখে বিশ্ব জনসংখ্যা ৫০০ কোটি ছাড়িয়ে গেলে সারাবিশ্বের জনমানুষের মধ্যে যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালনা পরিষদ এই দিবসটি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯০ সালের ১১ই জুলাই প্রথমবারের মতো ৯০টি দেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ বছর বাংলাদেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য– 'একটি ন্যায্য এবং আশাবাদী পৃথিবীতে পছন্দের পরিবার গড়ে তুলতে তরুণদের ক্ষমতায়ন করা'।

শত-সহস্র বছর লেগেছিল বিশ্বে ১০০ কোটি মানুষ হতে। পরবর্তী ২০০ বছরে বা তারও বেশি সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৭ গুণ। এরপর ১৯৮৭-তে বিশ্ব জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৫০০ কোটি, ১৯৯৭-তে ৬০০ কোটি, ২০১১-তে ৭০০ কোটি, ২০২১-এ ৭৯০ কোটি, ২০৩০-এ হবে ৮৫০ কোটি, ২০৫০ সালে বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৯৭০ কোটিতে, আর ২১০০ সালে হবে ১ হাজার ৯০ কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ প্রবণতায় ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্ব জনসংখ্যার যে চিত্রটি দাঁড়াবে, তা হিসাব করে জনমিতিবিদরা উদ্বেগের সঙ্গে বলেছেন, হয়ত একটা পৃথিবীতে এত মানুষের তখন সংকুলান হবে না। প্রয়োজন হবে আরও তিনটি পৃথিবীর। তাহলে পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল বাংলাদেশের কী অবস্থা দাঁড়াবে ২০৫০ সালে! তখন আমাদের আর কয়টি বাংলাদেশের প্রয়োজন হবে? জাতিসংঘ ও এর অঙ্গসংগঠন গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে বিশ্ববাসীকে শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ প্রজন্ম, সক্ষম দম্পতি, তাদের ছোটো পরিবার গঠন, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশুমৃত্যু রোধে স্বাস্থ্যসেবা, বাল্যবিবাহ না হওয়া, সহিংসতা, বৈষম্য ও মানবাধিকার নিয়ে প্রকৃতি-পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে নানা সচেতনতামূলক বাণী দিয়ে আসছে। উদ্দেশ্য, বিশ্বে যেন জনবিস্ফোরণ না ঘটে। যেন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ২০২৪ সালের শেষ দিকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ, জনসংখ্যা প্রায় ১৪৪ কোটি। দীর্ঘদিন শীর্ষে থাকা চীন এখন দ্বিতীয় স্থানে, জনসংখ্যা প্রায় ১৪১ কোটি। বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম, জনসংখ্যা ১৭.৩৬ কোটি।

বিশ্বজুড়ে জনবিস্ফোরণের বোঝা এই একটি পৃথিবীর পক্ষে বহন করা বা মানুষ-প্রকৃতি-পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে। এ কারণে গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলোর– কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, জলীয়বাষ্প, ওজোন, ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বনের অতিরিক্ত ব্যবহারে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশ এ জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতাজনিত দুর্যোগের অনিবার্য শিকার হয়ে তীব্র দাবদাহ, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এদেশের মানুষ, কৃষিজমি, সামগ্রিক উন্নয়ন ও অর্থনীতির ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিকে যেমন বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর ঘেঁষা অঞ্চল, মালদ্বীপ, নিউইয়র্ক, লন্ডন, সিউল, টোকিওসহ বহু উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রে তলিয়ে যাবে; আবার পৃথিবীপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে মেরু অঞ্চলের বরফ ও হিমবাহ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

পেয়ে জলে ভাসবে মানুষ। আর কোটি কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হবে এবং অকালে অনাহারে, নিরাশ্রয়ী হয়ে ও দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করবে। বাড়বে মানুষের দেশান্তরী হওয়া। গাছগাছালি ধ্বংস হবে। এক বৈশ্বিক মানবিক বিপর্যয় দেখবে তখন সারাবিশ্ব।

একসময় জনসংখ্যা নিয়ে শঙ্কিত ছিল বাংলাদেশ। বর্তমানে তা এসে দাঁড়িয়েছে বিশাল জনশক্তি হিসেবে। দেশের ভেতরে ও বাইরে এ জনশক্তি একদিকে যেমনি দিচ্ছে রেমিট্যান্সের জোগান, অন্যদিকে দেশকে গড়ে তুলছে সুপরিকল্পিতভাবে। জনশুমারি ও গৃহগণনার ২০২২-এর ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ১লা জানুয়ারি প্রাক্কলিত জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭ কোটি ১৫ লাখ ৯০ হাজার। এর মধ্যে ০ থেকে ৪ বছর বয়সি ১০.২২ শতাংশ, ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সি ১৮.৫৬ শতাংশ, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি ১৮.৬৭ শতাংশ, ২৫ থেকে ৩৯ বছর বয়সি ২২.২৮ শতাংশ, ৪০ থেকে ৪৯ বছর বয়সি ১১.৮৭ শতাংশ, ৫০ থেকে ৫৯ বছর বয়সি ৮ দশমিক ৯৩ শতাংশ, ৬০ থেকে ৬৪ বছর বয়সি ৩.৩৩ শতাংশ এবং ৬৫ ঊর্ধ্ব বয়সিদের সংখ্যা ৬.১৪ শতাংশ। যেখানে নারী ৮ কোটি ৭৩ লাখ ৯০ হাজার এবং পুরুষ ৮ কোটি ৪২ লাখ জন। ২৪শে মার্চ ২০২৪ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অডিটোরিয়ামে 'বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০২৩' ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে এই তথ্য পাওয়া যায়।

একটি দেশের প্রজনন ও মৃত্যুহার কমে আসার কারণে বয়স কাঠামোর মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। সে বয়স কাঠামোর পরিবর্তনের সময় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা যখন নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাতে সর্বাধিক দাঁড়ায়, তখন নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুকূলে থাকে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে যদি বিদ্যমান অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি আরও বেশি ত্বরান্বিত করা যায়, তবে সেই বিষয়টিকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বলতে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়স পর্যন্ত ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বলতে ০ থেকে ১৪ বছর ও ৬৫ বছরের বেশি বয়সের মানুষদের বোঝানো হয়। বিবিএসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৩৫ শতাংশ, যেখানে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৬৫ শতাংশ। এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এখন বাংলাদেশের সামনে। তবে শুধু জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বিপুল পরিমাণে থাকার মানেই কিন্তু নয় যে একটি দেশ এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে, যদি না তারা এই কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞে সম্পৃক্ত করতে পারে। বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ কর্মশক্তিতে পরিণত করে তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ওপরই নির্ভর করছে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' পাওয়ার বিষয়টি।

বিশ্বের যেসব দেশের মধ্যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর হার বেশি তাদের মধ্যে বাংলাদেশ থাকলেও এই ডিভিডেন্ডের সুযোগ বজায় থাকবে ২০৩৫ সাল পর্যন্ত। গত পাঁচ বছরে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়লেও দেশের ৬৫ শতাংশের বেশি মানুষ এখনো কর্মক্ষম। ফলে জনমিতিক সুবিধা কাজে লাগানোর এটাই সবচেয়ে অনুকূল সময়। কেননা, জনমিতিক এ সুবিধা বেশি দিন থাকবে না। গড় আয়ু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এ সুবিধা নিতে হলে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। গত শতকের ষাট ও নব্বইয়ের দশকে হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক সুবিধা নিয়ে বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পেরেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১১৯ জন। এছাড়া প্রতি হাজার জনসংখ্যার স্থূল জন্মহার ১৯ দশমিক ৪, যা ২০২২ সালে ছিল ১৯ দশমিক ৮। প্রতি হাজার জনসংখ্যায় স্থূল মৃত্যুহার ৬ দশমিক এক, যা ২০২২ সালে ছিল ৫ দশমিক ৮। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৩৩ জন এবং প্রতি লাখ জীবিত জন্ম শিশুর বিপরীতে মাতৃমৃত্যু হয় ১৩৬ জনের। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পুরুষদের প্রথম বিবাহের গড় বয়স ২৪ দশমিক ২ বছর এবং নারীদের ১৮ দশমিক ৪ বছর। প্রতি হাজার জনসংখ্যায় অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পল্লিতে আগমনের হার ২০ দশমিক ৪ এবং শহরে আগমনের হার ৪৩ দশমিক ৪। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অভিগমন প্রতি হাজারে ৬ দশমিক ৬১ জন থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮ দশমিক ৭৮ জন। আন্তর্জাতিক আগমন বা বহিরাগমন প্রতি হাজারে ২ দশমিক ৯৭ থেকে কমে হয়েছে ২ দশমিক ৩৭ জন। ২০২৩ সালে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০২২ সালের (৬৩ দশমিক ৩ শতাংশ) তুলনায় কমে হয়েছে ২০২৩ সালে ১৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ৬৬ শতাংশ (১০ কোটি ৫৬ লাখ, ইউএনডিপি)।

পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই। নতুন আর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, কিংবা কীভাবে মানুষের ভোগান্তি কমিয়ে আনা যায়, এসব নিয়ে গবেষণা চলছে প্রতিনিয়ত। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে, প্রতিদিন বিশ্বে প্রায় ২৫,০০০ মানুষ মারা যাচ্ছে খাদ্যাভ্যাস ও অপুষ্টিজনিত কারণে। এছাড়া সুপেয় পানির অপ্রতুলতা, বাতাসের বিষাক্ততা, সম্পদের বিলুপ্তি, বাসস্থানের সমস্যা, ওজোন লেয়ার ধ্বংস ইত্যাদি বহু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্ব। তার ওপর যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতা। তার মূলেও রয়েছে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দা, জলবায়ু-প্রকৃতির অসহিষ্ণু অবস্থা মোকাবিলায় মানুষ নিরন্তর সংগ্রাম করছে। সমৃদ্ধি আনছে জীবনযাপনে। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেন, এই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে ইতিহাসের বৃহত্তম যুব প্রজন্মের সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতিকে উদ্‌যাপন করছি। তারা শুধু ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে না, তারা এমন একটি ভবিষ্যৎ দাবি করছে, যা ন্যায়ভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই। তিনি আরও বলেন, আজকের অনেক তরুণ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, লিঙ্গ বৈষম্য, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, জলবায়ু সংকট ও সংঘাতের মুখোমুখি হচ্ছে। তবুও তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে সাহস, বিবেক স্পষ্টতা নিয়ে। তারা এমন এক সমাজের আহ্বান জানাচ্ছে, যেখানে তাদের অধিকার রক্ষা পায় এবং তাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করা হয়। দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন এমন নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে- যা শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্য সেবা, মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান এবং প্রজন্ম অধিকার নিশ্চিত করে।

শারমিন ইসলাম: প্রাবন্ধিক

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া ১৫ই জুলাই ২০২৫ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে বিনিয়োগ ভবনে 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন— পিআইডি

বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুব দক্ষতা

অনুপ বিশ্বাস

বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে পেশা ও শ্রমের সম্পর্কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে নতুন পেশার উদ্ভব হয় এবং পুরানো অনেক পেশা অবলুপ্ত হয়। নতুন নতুন পেশায় যুবদের সম্পৃক্তকরণ ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। আজকের যুবরাই একদিন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। এজন্য প্রয়োজন কর্মক্ষম দক্ষ জনগোষ্ঠী, দক্ষ যুবসমাজ।

১৫ই জুলাই 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস'। ২০১৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৫ই জুলাইকে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো পালিত হয় বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস। প্রতিবছর এই দিনে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে যুবকদের দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বোঝাতে নানান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। গতানুগতিক পড়াশোনা করে নয়; ব্যবহারিক দক্ষতার মাধ্যমেও যে নিজেকে আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত করা যায়— সেই সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্যই এই দিনটি উদ্‌যাপন করা। কারিগরি কাজকর্ম, লেখালেখি, আঁকা, গান, নাচ অথবা যে-কোনো দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে যে নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করা যায়, সেটাই সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই হলো এই দিনটির তাৎপর্য। এ দিবসটির অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে তরুণদের দক্ষতাকে আরও বাড়ানোর সুযোগ প্রদান এবং এর ফলে যুবসমাজের মধ্যে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়ানো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের সঙ্গে যুবক-যুবতীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই দিনটি পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ভিন্নধর্মী কর্মসংস্থান, সম্মানজনক কাজ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতায় তরুণদের এগিয়ে দেওয়ার জন্যই দিনটি পালন করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস পালন করা হয়। ইউনেস্কো-ইউনিভোক এ বছর বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে— 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল দক্ষতার মাধ্যমে যুবদের ক্ষমতায়ন'।

প্রচলিত কথা আছে— 'যে মানুষ যত দক্ষ, সে মানুষটা তার চারপাশের মানুষ থেকে তত উন্নত'। তেমনি, যে রাষ্ট্রের যুবসমাজ যত দক্ষ হবে, সে রাষ্ট্রও সার্বিকভাবে উন্নয়নে এগিয়ে থাকবে। অর্থাৎ দক্ষতা অর্জন বিষয়টি শহর, দেশ কিংবা জাতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। দক্ষতা না থাকার কারণে কাজের সুযোগ না পাওয়া কিংবা পছন্দের চাকরি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কষ্ট সেই বুঝবে যে এসবের ভুক্তভোগী। তাছাড়া আমাদের অর্জিত শিক্ষা কেন্দ্রিক আমাদের তরুণরা অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিনিয়তই। কোনো কাজ করছে না, প্রশিক্ষণও নিচ্ছে না, আবার শিক্ষার্থীও নয়— এমন যুবকদের বলা হচ্ছে NEET। অর্থাৎ Not in Education, Employment or Training। আর এই NEET দলে তালিকাভুক্ত আছে বিশ্বের প্রায় ২৬৭ মিলিয়ন যুবক। চারপাশে তাকালে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের দেশে অনেক কাজ আছে। কিন্তু সেই কাজে যোগ দেওয়ার দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ নেই। যে কারণে কর্মজীবন নিয়ে যুবসমাজ হতাশ।

বাংলাদেশের অন্যতম একটি সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব। অন্যদিকে চাকরির ক্ষেত্রে চাওয়া হয় দক্ষতা, অভিজ্ঞতা। বর্তমান যে সময়ে আমরা আছি, এখানে কাউকে বসিয়ে রেখে কাজ শিখিয়ে দক্ষ করে তোলাটা কঠিন। অভিজ্ঞতা বাড়ে দক্ষতায়। শেখার আগ্রহ, জানার আগ্রহ অনেকেরই নেই। আমাদের আরও একটি সমস্যা প্রায় সবাই একই ধরনের কাজ করতে আগ্রহী। যেমন: সরকারি চাকরির প্রতি অমোঘ প্রতিযোগিতা। কিন্তু সরকারি চাকরির বাইরেও

একাধিক কর্মক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে যুবসমাজের আগ্রহ অনেকটাই ক্ষীণ। এতে করে সময় অতিবাহিত হতে থাকে, চাকরি হয় না। বেকারত্ব বাড়ে। কিন্তু হাতেকলমে শিক্ষা কিংবা তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রিক দক্ষতা, অভিজ্ঞতা অর্জন করলে কাজের অভাব হয় না।

বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আগামীর বাংলাদেশ বির্নিমাণে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। উন্নত ও সমৃদ্ধ আগামীর বাংলাদেশ গঠনে যুব শক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে বাংলাদেশের জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা কাজে লাগিয়ে দেশের সমৃদ্ধি অর্জন। এক্ষেত্রে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নানামুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্প।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ক্রম পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল পর্যায়ে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় ও মান সংরক্ষণের ম্যান্ডেটসহ ২০১৮ সালের ৪৫ নম্বর আইনবলে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনার দিকনির্দেশনা সংবলিত 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা ২০২০' প্রণয়ন করা হয়। প্রধান উপদেষ্টাকে চেয়ারম্যান করে গঠিত গভর্নিং বোর্ড এবং প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব-এর সভাপতিত্বে গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির নীতিগত দিকনির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম। একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছেন।

কোনো ব্যক্তি সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অথবা স্ব-উদ্যোগে অর্জিত জ্ঞান অর্জন করলেও, তা বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য প্রাসঙ্গিক পেশাভিত্তিক দক্ষতায় রূপান্তর করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে প্রমিত পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, পেশা ও দক্ষতার স্তরভিত্তিক মানদণ্ড নির্ধারণ, এবং নির্ভরযোগ্য দক্ষতা যাচাই ও সনদায়ন প্রক্রিয়া চালু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়া এমন হতে হবে, যাতে তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। একইসাথে, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ এবং সারাদেশে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সুসমন্বয় ও তত্ত্বাবধান প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। পেশা ও পর্যায়ভিত্তিক দক্ষতা যাচাই, মূল্যায়ন ও সনদায়ন প্রক্রিয়াকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মূল চ্যালেঞ্জ। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০২২ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৫ বছর মেয়াদি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৭ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৪'-এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী প্রায় ১২ কোটি ১৫ লক্ষ যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ। অন্যদিকে প্রতিবছর দেশের শ্রমবাজারে প্রায় ২২ লক্ষ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী যুক্ত হচ্ছে। এমন অবস্থায় শ্রমবাজারে যুক্ত হওয়া যুবশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব না হলে জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ যেমন সম্ভব হবে না, তেমনি তা হবে এক সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করা।

UNESCO-UNEVOC-এর তথ্যমতে, ২০৩০ সালের মধ্যে ৮৬ শতাংশ নিয়োগকারী নিজ প্রতিষ্ঠানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিবে। একইসাথে ২০৩৩ সাল নাগাদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের বাজারমূল্য দাঁড়াবে ৪.৮ ট্রিলিয়ন ডলারে, যা মূলত অল্প সংখ্যক অংশীজনের মধ্যে সীমিত থাকবে। অথচ, এখনও বিশ্বের ৪৮ শতাংশ শিক্ষার্থী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কাজের জন্য প্রস্তুত নয়। স্বল্প আয়ের দেশসমূহে ৯০ শতাংশ কিশোর-কিশোরী ইন্টারনেট সংযোগের বাইরে আছে। এআই পেশাজীবীদের মাত্র ২২ শতাংশ নারী। মাত্র ১০ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এআই বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশনা প্রদান করছে। এছাড়া শ্রমবাজারের চাহিদানুরূপ দক্ষতা না থাকায় যুবদের প্রতি ১০ জনে ৭ জনই অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ অবস্থানে রয়েছে।

National Skills Portal (NSP) (skillsportal.gov.bd)

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে National Skills Portal (NSP) নামক ওয়ান স্টপ প্ল্যাটফর্ম-এর মাধ্যমে। এ পোর্টালে এনএসডিএ অনুমোদিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, অভিন্ন ও প্রমিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ-সামগ্রী, এনএসডিএ'র দক্ষতা সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মূল্যায়ন কাঠামো ও মূল্যায়ন উপকরণ, মূল্যায়নকারী, শিল্প দক্ষতা পরিষদ, দক্ষতা বিষয় নীতি-কৌশলসহ যাবতীয় তথ্যাদি ১৬টি মডিউলে সন্নিবেশিত রয়েছে।

এই পোর্টাল ব্যবহার করে আগ্রহীরা নিজ পছন্দমতো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পেশা ও পর্যায়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জন ও সনদ পেতে পারে। একইসাথে, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুমোদিত ও দক্ষ প্রশিক্ষক, মূল্যায়নকারীর সন্ধানসহ প্রমিত পাঠ্যক্রম ব্যবহারের সুযোগ নিতে পারে। বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসে এ পোর্টালে 'লাইভ জব অপরচুনিটি' মডিউল উন্মুক্ত করা হয়। এতে মালিকরা যেমন দক্ষ কর্মী খুঁজে পাবেন, তেমনি দক্ষ ব্যক্তি পাবে যোগ্যতামাফিক পছন্দনীয় কাজের সুযোগ।

আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবদের দক্ষ করে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী শ্রমের চাহিদাপূরণ, প্রযুক্তির পরিবর্তনে কর্ম-সংকোচনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মপোযোগী করা, পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক বাজারে অধিকসংখ্যক দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা অপরিহার্য। যুগোপযোগী দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমেই আমাদের যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে। তাই দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে তাদের সচেতন করা, আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করা ও কর্মসংস্থানের পথ নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষেত্রে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস পালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অনুপ বিশ্বাস: প্রাবন্ধিক

পল্লিকবির ‘কবর’ ঘিরে

সুজন বড়ুয়া

জামাল স্যার ক্লাসে ঢুকতেই পিন পতন নীরবতা। এতক্ষণ সবাই হইহল্লা গুলবাজিতে ব্যস্ত ছিল। স্যার আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে মনোযোগী হয়ে ওঠে সবাই।

জামাল স্যার বললেন, তোমরা কেমন আছো?

ক্লাসের সব ছাত্রের কেমন হকচকানো ভাব। স্যার তো কখনো এভাবে ক্লাস শুরু করেন না! আজ যেন স্যার একটু হালকা মেজাজে আছেন। অন্যদিনের মতো টানটান সময়ানুগ ও বিষয়মুখী নন। অনেকটা আড্ডার ছলে কথা শুরু করেছেন আজ। এটা হয়ত স্যারের নতুন চমক।

স্যারের পুরো নাম সৈয়দ শাহ জামাল। তিনি বাংলা বিষয়ের শিক্ষক। ক্লাস টেনে ফুয়াদদের বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র দুই বিষয়ই তিনি পড়ান। বাংলার শিক্ষকের যত রকমের গুণাবলি থাকা দরকার সবগুলো স্যারের মধ্যে বর্তমান। শুদ্ধ উচ্চারণ, আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি, প্রেরণাসঞ্চারি নাটকীয় পাঠদান ইত্যাদি। স্কুলে সব দিক দিয়ে জামাল স্যার অন্য স্যারদের চেয়ে আলাদা। জনপ্রিয়তায়ও তাই তিনি এগিয়ে।

কিন্তু আজ স্যারের সুর বুঝতে না পেরে ফুয়াদরা সবাই কেমন ঝিম মেরে রইল।

জামাল স্যার আবার বলেন, আমি জানতে চাইলাম তোমরা কেমন আছো

এবার ক্লাসের সব ছাত্র সমস্বরে বলে উঠল, স্যার, ভালো আছি।

ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সঙ্গে যোগ করল, স্যার আপনি কেমন আছেন?

স্যার বলেন, আমিও ভালো আছি। শোনো, শুরুতে আমার কথা শুনে তোমরা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলে, তাই না? কখনো তো এভাবে তোমাদের খবর নেওয়া হয় না। এসে ধুমধাম ক্লাস করাই আবার চলে যাই। কিন্তু আজ আমি তৈরি হয়ে এসেছি, আজ ক্লাসের সময়টা অন্যভাবে কাটাব। আজ শুধু তোমাদের খোঁজখবর নেব। তোমাদের পরিবার সম্পর্কে তো তেমন কিছু জানি না। একটু জানা দরকার। সংক্ষেপে অন্তত আজ তোমরা একে একে সবাই বলো, বাড়িতে তোমাদের আর কে কে আছেন।

ছাত্রদের আরেক দফা থমকে যাওয়ার পালা। এ ওর মুখের দিকে তাকায়– স্যার যে কখন কী করেন!

তবু বলা শুরু করল ছাত্ররা। ধারাবাহিকভাবে নয়, যার যখন খুশি, দাঁড়িয়ে বলতে লাগল একজনের পর একজন। কেউ বলল, বাড়িতে আমার মা-বাবা, দাদা-দাদি আর ফুফু আছেন। কেউ বলল, দাদা-দাদি বাবা-মা আর আমি আছি। কেউ বলল, আমার বাবা-মা, চাচা-চাচি আর ছোটো বোন আছে। কেউ বলল বাবা-মা, দাদি আর আমি একা। কেউ বলল, স্যার আমার সবাই আছেন দাদা-দাদি, বাবা-মা, চাচা-ফুফু আর আমার দুই ভাই, তিন বোন। এভাবে পুরো ক্লাসের সবার বলা প্রায় শেষ। সবার শেষে দাঁড়াল ফুয়াদ। ষোলো বছর বয়স। মাঝারি উচ্চতা। রোগা শরীর। গাঢ় শ্যামলা গায়ের রং। শুকনো করুণ মুখ। ফুয়াদ বলল, স্যার, আমার কেউ নেই, দাদি, বাবা-মা, বোন সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। শুধু আমার দাদা আছেন। আমি দাদার কাছে থাকি।

দাদাই আমার সব– মা, বাবা, ভাই সব। দাদা আমার দেখ শোনা করেন।

শুনতে শুনতে স্যারের মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, বাহ্, বেশ, আমি পেয়ে গেছি। কিন্তু পরক্ষণেই যেন স্যার নিজেকে সামলে নিলেন আবার। করুণ মুখ করে বললেন, ওহ্, ফুয়াদ, তোমার জন্য অনেক শুভকামনা। তোমার জীবনটা সত্যি অনেক কষ্টের, বেদনাময়। তবে আজ আমি তোমার মতোই একজনকে খুঁজছিলাম। যাক, শেষ পর্যন্ত আমি পেয়ে গেলাম।

ছাত্ররা আবার যেন চমকে উঠে নড়েচড়ে বসল। সবার মধ্যে উশখুশ ভাব, আজ স্যারের এসব কথার উদ্দেশ্য কী?

স্যার নিজের ধ্যানে কথা শুরু করেন আবার, আজ যেন তোমাদের কী পড়াবার কথা?

ক্লাস ক্যাপ্টেন বাহারুল দাঁড়িয়ে বলল, স্যার, আজ থেকে 'কবর' কবিতা পড়ানো শুরু করার কথা।

হ্যাঁ, 'কবর' কবিতা। আচ্ছা, তোমরা বলো তো কবিতাটা কার লেখা?– স্যার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছাত্রদের দিকে তাকান।

ক্লাসের সবাই এবার প্রায় একসঙ্গে বলে, পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের লেখা।

বাহ্, বেশ।– একটু থেমে প্রসন্ন কণ্ঠে স্যার আবার বলে ওঠেন, কবিতাটা তোমাদের সিলেবাসভুক্ত, তাই না? এবং কবিতাটা বেশ বড়ো। তাই একটু সময় নিয়ে কবিতাটা ভালোভাবে পড়তে হবে। পড়া শুরু করার আগে কবি ও কবিতাটা সম্পর্কে কিছু কথা তোমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি।

স্যার বলতে থাকেন, তোমরা জানো, পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস একই জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে। তাঁর পিতা আনসারউদ্দীন মোল্লা ও মাতা আমিনা খাতুন। শোভারামপুরের অম্বিকা মাস্টারের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৩১ সালে বাংলা বিষয়ে বিএ আর এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। অল্প বয়সে ছাত্রজীবনে তিনি লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর কাব্যের গঠনশৈলী ও বিষয়-অনুষঙ্গে বাংলার গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি এবং লোক-সাহিত্যের আঙ্গিক ও উপাদানের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের জন্য তাঁকে 'পল্লিকবি' অভিধায় ভূষিত করা হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে তোমরা তাঁর কবিতা ও রচনা পড়ে এসেছ। তেমন দুএকটা কবিতার কথা কি তোমাদের মনে পড়ে?

ফুয়াদ দাঁড়িয়ে বলল, স্যার, মনে আছে 'আসমানী' কবিতা। বাহারুল বলল, 'নিমন্ত্রণ'। সুশীল বলল, ' রাখাল ছেলে'। শাহানা বলল, স্যার, প্রথম শ্রেণির সবুজ সাথি বইয়ে 'মামার বাড়ি' পড়েছি।

স্যার বললেন, আরো ছিল 'খুকির সম্পত্তি', 'প্রতিদান' এসব কবিতা-পদ্যও তোমরা আগের পাঠ্যবইগুলোতে পড়ে এসেছ। একটা বিষয় কি তোমরা খেয়াল করে দেখেছ, কবিতাগুলোতে গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের ছবি, গ্রামের পরিবেশ-প্রকৃতি কত সহজ-সরল-সরস শব্দমালায় জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের সমগ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ-কথা প্রযোজ্য। সবাই সহজসরল বুননে কবিতা লিখতে পারেন না। এর জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। জসীমউদ্‌দীন গ্রামের জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রকৃতিকে আপন স্বকীয়তায় বুকের মধ্যে ধারণ করছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এমন অনন্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। জসীমউদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যের সেই বিরল কণ্ঠস্বর, যিনি শহুরে চেতনার বাইরে দাঁড়িয়ে কবিতার শিরায় শিরায় এনেছিলেন বাংলার গ্রামীণ আত্মার প্রবাহ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শিক্ষার্থী জসীমউদ্‌দীন 'কবর' কবিতাটি জমা দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায় কবিতাটি প্রবেশিকার বাংলা পাঠ্যবইয়ে স্থান পায়। কবিতাটি পড়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবিস্ময়ে বলেছিলেন, 'এ ছেলে রসের কবি, ওকে আলাদাভাবে দেখতে হবে।' অতি তরুণতম অখ্যাত কবি জসীমউদ্‌দীন এবং সদ্য ভূমিষ্ঠ তাঁর 'কবর' কবিতার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ছিল নিশ্চয় একটি বড়ো স্বীকৃতি। বিশেষ কাব্যধারার এই নব্য কবিকে পাঠকরা দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে চিনে নিতে শুরু করেছিলেন।

জসীমউদ্‌দীন 'কবর' কবিতাটি লিখেছিলেন ১৯২৫ সালে। এ বছর ২০২৫ সালে 'কবর' কবিতা রচনার শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। এ-কালের বাংলা কবিতার পাঠকদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শত বছর ধরে এ-কবিতা অসামান্য ব্যঞ্জনায় পাঠকের হৃদয় আমোদিত করে যাচ্ছে। গৌরবময় এ ক্ষণটিকে আমাদের বর্ণিল উদ্‌যাপনে রাঙিয়ে তোলা দরকার। তার আগে কবিতাটির ভেতরের সৌন্দর্য, ছন্দ ও অলংকার মাধুর্যের স্বাদ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হতে পারে। এবার আমি একবার কবিতাটি পড়ি, তোমরা শোনো।

স্যার তার আবেগময় কণ্ঠে কবিতাটি পড়ে গেলেন মোহনীয় ভঙ্গিতে। দু'একটি অংশ পুনরাবৃত্তি করে ব্যাখ্যাও করে দিলেন তিনি। ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনল চুপচাপ।

স্যার আবার বলা শুরু করেন, তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ এটি গ্রামীণ জীবনঘনিষ্ঠ করুণরসের কবিতা। কয়েকটি পারিবারিক বিয়োগান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে কবিতাটি। কাব্য, সাহিত্য বস্তুত এসব হলো কবি বা স্রষ্টার বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার অনুকরণ। কবি জসীমউদ্‌দীনের বাস্তব জীবনে অল্প বয়সে এমন কিছু পারিবারিক স্বজন বিয়োগের ঘটনা ঘটেছিল। সেই করুণ বেদনানুভূতিকে তাঁর এই 'কবর' কবিতায় শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন তিনি। তোমাদের কাছে হয়ত এখন একটু কঠিন মনে হবে, তবে বড়ো হলে তোমাদের নিশ্চিত কাজে লাগবে, তাই বলছি, শোনো। এ কবিতায় সফল শিল্পরূপের একটি মেলবন্ধন আছে। বিষয়োপযোগী সুললিত উপমা-চিত্রকল্প ও ভাবালংকারের সঙ্গে এখানে ঘটেছে মধুর ছন্দালংকারের সুসমন্বয়। কবিতাটি লেখা হয়েছে ছয় মাত্রা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। ছন্দশাস্ত্রের মধ্যে ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দটি একটু ধীর লয়ের। এ-ছন্দে বেদনামিশ্রিত ঘটনাশ্রয়ী বিষয়ানুষঙ্গ বেশি হৃদয়গ্রাহী রূপ লাভ করে। সে দিক থেকে জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা একটি সার্থক সৃষ্টি।

> 'হেসো না হেসো না– শোনো দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে
> দাদি যে তোমার কত খুশি হতো, দেখতিস যদি চেয়ে!
> নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, "এতদিন পরে এলে,
> পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে"।
> আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়
> কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিজ্‌ঝুম নিরালায়।'

বাংলা সাহিত্যে গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা হৃদয়-ছোঁয়া অপূর্ব কাব্যভাষার এ এক আশ্চর্য উদাহরণ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে বাংলা কাব্য-ইতিহাসে এটি একটি মাইলস্টোন কবিতা।

একটানা কথা বলে একটু দম নিলেন স্যার। তারপর বলেন, পরবর্তী কয়েকটি ক্লাসে 'কবর' কবিতাটি সম্পর্কে আমরা আরো আলোচনা করব। এমন একটি সুন্দর কবিতা রচিত হওয়ার শতবর্ষ পরে পাঠ করছি আমরা। সুনিপুণ শিল্পমানের জন্য কবিতাটি এখনো সবার কাছে পরম আদরণীয়। এটি নিশ্চয় আমাদের জন্য একটি অনন্য উপহার। এই উপহারটি দিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বর্ণাঢ্য আয়োজনে কবিকে স্মরণ করা কি আমাদের উচিত নয়?

ক্লাসের সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, স্যার, অবশ্যই স্মরণ করা উচিত।

অতি শীঘ্রই তোমাদের স্কুলে আমরা সেই আয়োজন করছি। কবর কবিতাটিকে আমি নাট্যরূপ দিয়েছি। এ নাটকটি মঞ্চায়ন করে পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনকে স্মরণ করব এবং কবর কবিতার শতবর্ষ উদ্‌যাপন করব।

ক্যাপ্টেন বাহারুল দাঁড়িয়ে বলল, স্যার, নাটকের নাম কী?

নাটকের নাম– পল্লিকবির 'কবর' ঘিরে।

ছাত্ররা কেউ কেউ যেন এবার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল, স্যার, চমৎকার নাম হয়েছে।

স্যার বললেন, নাটকটি মঞ্চায়নের কাজে তোমাদেরও সাহায্য লাগবে। তোমাদের কাউকে কাউকে নাটকে অভিনয় করতে হবে। নাটকের পাত্রপাত্রী খোঁজার জন্যই আমার আজকের এত গৌরচন্দ্রিকা। তোমরা নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ।

স্যার খানিক থেমে আবার বলতে শুরু করেন, শোনো, কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম না, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকেই ভালো কাব্য, সাহিত্য সৃষ্টি হয়। তেমনি অভিনয় করতেও বাস্তবের ছোঁয়া লাগে। তোমাদের মধ্য থেকে কোন চরিত্রে কাকে নিলে ভালো হবে সেটা বোঝার জন্যই ক্লাসের শুরুতে তোমাদের পারিবারিক পরিচয় নিচ্ছিলাম। আমি ঠিক করেছি নাটকের নাতি চরিত্রে ফুয়াদকে নেব। ফুয়াদই প্রধান চরিত্র দাদুর সঙ্গে নাতির অভিনয় করবে। তার মানে নাটকের দ্বিতীয় নায়ক ফুয়াদ।

ক্লাসের সবাই ঔৎসুক্য দৃষ্টিতে দেখতে থাকে ফুয়াদকে। সবার অবস্থা দেখে হঠাৎ কেমন লজ্জা-সংকোচে কুঁকড়ে গেল ফুয়াদ। সে হাসবে, না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারল না। তার কেবল দাদি, মা-বাবা আর বোনের কথা মনে পড়ছিল।

এরই মধ্যে স্যার ফুয়াদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, ফুয়াদ, তুমি দাঁড়াও। কিছুক্ষণ আগে আমি যে পড়লাম, কবিতাটা তখন মনোযোগ দিয়ে শুনেছ?

স্যার শুনেছি।– ফুয়াদ জড়সড় হয়ে বলল।

তা হলে বলো তো, কবিতায় কয়জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে?

ফুয়াদ চোখ বন্ধ করে মনে মনে ভাবতে থাকে। তারপর বলে,

স্যার, কবিতায় পাঁচ জনের মৃত্যুর কথা আছে– দাদি, বাবা, মা, বুবু আর ছোটো ফুফু।

স্যার উল্লসিত হয়ে ওঠেন, বাহ্, ঠিক আছে, তুমি পারবে। তৈরি হয়ে নাও।

তারপর স্যার আবার সবার দিকে তাকান, নাটকে অভিনয়ের জন্য তোমাদের মধ্যে আর কাকে কাকে নেব, তা কালকের ক্লাসে জানাব। তোমরা সবাই কবিতাটা ভালো করে আবার পড়ে এসো। আজ ক্লাস শেষ।

স্যার বেরিয়ে যাওয়ার পর ক্লাসের সবাই এসে ঘিরে ধরল ফুয়াদকে। নায়ক, নায়ক বলে ক্ষ্যাপাতে লাগল একটানা। কিন্তু ফুয়াদ না পারছে হাসতে, না পারছে কাঁদতে, না পরছে নিজেকে সরিয়ে নিতে। সে দাঁড়িয়ে আছে বিমূঢ় বিহ্বল। তার ভেতরের কষ্টটা কেউ একবারও ভেবে দেখছে না। নায়ক হওয়ার কী যোগ্যতা তার আছে? সে জানে– তার একটাই যোগ্যতা সে এতিম, তার দাদি, বাবা, মা, বোন কেউই বেঁচে নেই। এ কারণেই স্যার তাকে নাতি চরিত্রের জন্য পছন্দ করেছেন। একসঙ্গে এত স্বজন হারানোই বুঝি যোগ্যতা! আহা, কী নিয়তি আমার! ভাবতেই হঠাৎ বুকটা ভারি হয়ে এলো ফুয়াদের। কেমন এক খারাপ লাগা অনুভূতি যেন আচ্ছন্ন করে বসল তাকে।

কিন্তু ফুয়াদ একসঙ্গে খুঁজে পেল হারানো আপনজনদের। আশ্চর্য সবুজ গাছপালা ঘেরা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফুয়াদ পৌঁছে গেল সুন্দর ছায়াময় একটি গ্রামে। সেখানে স্বচ্ছ জল টলমল দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন দাদি, বাবা, মা আর বোন। তারা বললেন, ফুয়াদ, তুমি স্কুল থেকে এ পথে ফিরবে বলে অপেক্ষা করছিলাম আমরা। মা বলেন, ফুয়াদ, আমি জানি, আজ তুমি একইসঙ্গে অনেক আনন্দিত, আবার ব্যথিতও। বাবা বলেন, ফুয়াদ, তুমি সব সময় এমন মনমরা হয়ে থাকো কেন বাবা? দাদি বলেন, আসো নাতি, তোমার মাথায় আমি একটু ফুঁ দিয়ে দিই। তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি সবখানে জয়ী হবে। সামনে এগিয়ে যাও।

ফুয়াদ আবার সামনে হাঁটতে শুরু করে। কিছুদূর এগোতেই সে দেখে দাদুর মতো পাঞ্জাবি পরা একজন বৃদ্ধ হাসিমুখে ডাকছেন তাকে। ফুয়াদ কাছে যেতেই বৃদ্ধ বলেন, আমি জসীমউদ্‌দীন, লোকে আমাকে পল্লিকবি বলে। আজ স্কুলে তোমরা আমার কবর কবিতা পড়েছ।

ফুয়াদ বলে, দাদু, আপনি কী করে জানলেন?

পল্লিকবি মৃদু হেসে বলেন, বারে, তোমরা আমার কবিতা পড়বে, আমি জানব না? আমি যে স্রষ্টা, স্রষ্টার সব জানা হয়ে যায়। আজ থেকে ঠিক একশ' বছর আগে আমি 'কবর' কবিতাটি লিখেছিলাম। আমার দুঃখ কী জানো দাদু? আমি যে জীবনের কথা লিখেছি, যে মায়া-মমতা-ভালোবাসার কথা লিখেছি, যে গ্রাম-প্রকৃতি-পরিবেশের কথা লিখেছি, এখন কি আর সেসব আগের মতো আছে? এখন সব বদলে গেছে। মানুষও কেমন যন্ত্রের রূপ ধারণ করেছে। গ্রাম এখন আর বিশুদ্ধ গ্রাম নাই। গ্রামের এখানে সেখানে এখন শহরের পাগলা হাওয়ার তোড়। এখন প্রায় গ্রামেই দেখতে পাবে ইটভাটা। ইটভাটার জ্বালানি বানানোর জন্য নির্বিচারে উজাড় করা হচ্ছে গাছপালা, বনাঞ্চল। দিকে দিকে উঠছে বিষাক্ত কালো ধোঁয়া। কোথাও বন পুড়িয়ে বানানো হচ্ছে চিংড়িঘের। পাহাড় কেটে করা হচ্ছে আবাসভূমি। গলা টিপে মারা হচ্ছে নদীগুলোকে। পরিবেশ ও উন্নয়নের দ্বন্দ্বে সবুজ সবখানে সংকুচিত, ছন্নছাড়া। মানুষের হাতে

প্রকৃতি বিনাশ ঘটছে হরদম। মানুষ ভুলে গেছে তার অধিকার। এই পৃথিবী শুধু মানুষের একার নয়; পৃথিবীর অন্য বাসিন্দা যারা আছে, তাদেরও। মানুষের বাঁচার জন্যই দরকার বন, উদ্ভিদ, পাহাড়, নদী, জলাশয়, পরিবেশ ও প্রতিবেশের অন্যান্য প্রাণী। এই প্রকৃতিকে নিজের মতো থাকতে দিয়েও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করেছে আগের দিনের মানুষেরা। কিন্তু এখন মানুষের বেড়ে গেছে অসম্ভব চাহিদা ও লোভ। এই দেখো না, আমার স্মৃতি রক্ষার্থে বাড়ি সংলগ্ন অম্বিকাপুরে সরকার প্রতিষ্ঠিত জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি কী অযত্নে ধুঁকছে, আমার কবরস্থানটি কী অবহেলায় পড়ে আছে! এমন কঠিন রুক্ষ যান্ত্রিক সময়ে ফুয়াদ, তোমরা আমার কোমল অনুভূতির কবিতা পড়ছ, কবিতার নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চায়ন করতে যাচ্ছি দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। তোমাদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

ফুয়াদ এবার বলে, দাদু, এ-কৃতিত্ব আমার নয়। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সৈয়দ শাহ জামাল স্যারের। এই ধন্যবাদ তারই প্রাপ্য।

তুমি আমার হয়ে তোমার স্যারকে আমার ধন্যবাদ পৌঁছে দিও। তার মতো শিক্ষক গড়ে উঠুক বাংলার ঘরে ঘরে। তোমাদের এই সুন্দর উদ্যোগ সফল হোক। আশা করি তোমাদের নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে গ্রাম ও প্রকৃতি-পরিবেশের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ জেগে উঠবে; নতুন করে মানুষের মধ্যে ভালোবাস, মায়া-মমতা ও শুভবুদ্ধির জাগরণ ঘটবে। বলতে বলতেই পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন দাদু কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ফুয়াদের ইচ্ছে হলো, পল্লিকবি দাদুকে নাটক মঞ্চায়নের দিন দেখতে আসার জন্য অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখতে। তাই ফুয়াদ পেছন থেকে ডাকতে লাগল, দাদু দাদু, শোনেন...।

নিজের কথা বলার শব্দেই ঘুম ভেঙে গেল ফুয়াদের। সংবিৎ ফিরে পেলো সঙ্গে সঙ্গে। আরে, আমি যে বিছানাতেই শুয়ে আছি! এতক্ষণ তবে স্বপ্ন দেখছিলাম!

সকাল হয়ে এসেছে। আর ঘুম আসছে না ফুয়াদের। এপাশ-ওপাশ করতে করতে মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আজান ভেসে এলো কানে। একটু পর বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের দরজা খুলল ফুয়াদ। বাইরে ধলপ্রহরের আলো ফুটছে। আষাঢ়ের মেঘ মেঘ আবহাওয়া। এক দমকা ঠান্ডা হাওয়া এসে ছুঁয়ে গেল ফুয়াদকে। উঠানের পাশে জাম-জারুলের পাতাগুলো কাঁপছে থিরথির করে। জারুলের ডালে ডালে থোকা থোকা ফুল যেন ঘুম ঘুম চোখ মেলছে। যেন আড়মোড়া ভাঙছে ঝাঁকড়া মাথা নারকেল-সুপারি গাছ। বাড়ির হাঁস-মুরগি-কবুতরগুলো মন্থর পা ফেলছে আঙিনায়। অদূরে মাচায় লাজুক বধূর ঘোমটার মতো দুলছে আলুথালু লাউডগা আর কলাপাতা। ডানা ঝাপটিয়ে নতুন ভোরের বার্তা দিচ্ছে পাখিরা। সব কেমন স্বপ্নময় নিষ্পাপ মায়ামাখা– এই বাড়ি, এই উঠান, এই গাছ-ফুল-পাখি, এই গ্রাম-প্রকৃতি সব। অনেক দিন পর ফুয়াদ নতুন ভালোলাগায় আপ্লুত হলো আজ। পল্লিকবির আশিসবাণী কানে বাজে তার। নতুন দিন নতুন শুরু। নতুনের আবাহনে অকৃত্রিম ভালোবাসাময় প্রাণবন্ত সবুজ পৃথিবীকেই আবার খুঁজে নিতে চায় ফুয়াদ।

———— ○ ————

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড পেল ৩০ শিল্পপ্রতিষ্ঠান

দেশের শিল্পখাতকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়নের মডেল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ‘গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ প্রদান করা হয়। ২৪শে জুন রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন এ পুরস্কার বিতরণ করেন।

উপদেষ্টা বলেন, গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড শুধু একটি পুরস্কার নয়, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। আমরা চাই শিল্পখাত উৎপাদনের পাশাপাশি পরিবেশ ও শ্রমিক কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখুক। তিনি বলেন, এ পুরস্কার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। ১৬টি শিল্প সেক্টরের ৭২টি প্রতিষ্ঠান থেকে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক সুবিধা, নিরাপত্তা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের ভিত্তিতে ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

উপদেষ্টা শ্রমিক-মালিক সমন্বয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, শ্রমিকদের ঘাম শুকানোর আগেই তাদের মজুরি পরিশোধ করতে হবে। অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক তার শ্রমিকদের সন্তানের মতো দেখেন, যা প্রশংসনীয়। তিনি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে আইএলও’র নীতিমালা অনুসরণেরও তাগিদ দেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অসামান্য অবদান রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপদেষ্টা নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির ওপরও জোর দেন। তিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য অনুপ্রেরণা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড বাংলাদেশের শিল্পখাতকে বিশ্বমানে পৌঁছে দেবে।

অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এটি শুধু পরিবেশবান্ধব শিল্পকে উৎসাহিত করছে না, বরং আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের সহ-সভাপতি ও শ্রমিক প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও টিসিসি সহসভাপতি মো. আরদাশির কবিরসহ আইএলও এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: প্রণব দাশ

ট্রাজেডি

তানিয়া খান

আমি লিখে যাই অমর কবিতা
সমরের ময়দানে,
যেখানে অস্ত্র ঝঞ্ঝায় তবু
কলম না থামে

আমি লিখে যাই বন্দি পাখির
মুক্তির উপায় গাথা,
যেখানে ছটফট ডানা দুটি বাঁধা
তবু নোয়ায় না বীর মাথা।

লিখে যাই প্রিয় মাটির বুকে
কত শত ঋণ নিয়ে,
বেড়ে ওঠে এক জাতি
শুধু স্বপ্ন দেখতে গিয়ে!

কত শত ব্যথা, কত শত ভুল
রক্ত ঝরায়, নিষ্পাপ ফুল
রচে যায় মৃত্যুগাথা,
বুকের ভেতর দাউদাউ জ্বলে
গলিত সবুজ পাতা।

বিপ্লবী ফুল

হানিফ রাজা

রক্তেভেজা মাটির বুকে
ফুটে শত ফুল,
ভয় না পেয়ে মাথা তুলে
ডাকে নতুন কূল।
চুপ করে না অন্যায় দেখে
জোরে সত্য বলে,
রোদে পুড়ে, বৃষ্টি ভিজে
সম্মুখ পানে চলে।
ফুলটি ফুটে সাহস জাগে
জ্বলে চোখে আগুন,
ভয় পায় না তীরের শব্দ
জাগে মনে ফাগুন।
জেগে উঠে প্রতিবাদে
কণ্ঠে বিপ্লব সুর,
দাঁড়ায় থাকে বুক পেতে
আর শত্রুরা হয় দূর।
আঁধার ভেঙে জ্বালে আলো
সত্য রয় যে-গাঁথা,
ভয়ের মুখে হাসে চেয়ে
নত হয় না মাথা।

বিজয় এলো শেষে

ফরিদ সাইদ

কোটাবিরোধী আন্দোলন
দীর্ঘ দিনের দাবি
ত্যাগের মাঝে ঢেকে ছিল
বিজয় লাভের চাবি।

তাইতো বুঝি আবু সাঈদ
দাঁড়ালো বুক পেতে
গুলি লেগে শহিদ হলে
সবাই ওঠে চেতে।

প্রতিবাদী ছাত্রসমাজ
দেশকে ভালোবেসে
স্বার্থ ছাড়া অকাতরে
জীবন দিলো হেসে।

শহিদ হলো মাহফুজ মুগ্ধ
পানি নিয়ে এসে
বীর শহিদদের আত্মত্যাগে
বিজয় এলো শেষে।

তারুণ্যের শক্তি

তানিয়া রহমান

হে তরুণ –
তোমরাই তো আগুনের পরশমণি
দিশেহারা জাতিকে তোমরা
বার বার শুনিয়েছ বিজয়ের জয়ধ্বনি।
তোমরাই তো জাতির সুস্থ

বিবেকের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি
শক্ত হাতে হাল ধরেছ
জাতির পাশে থেকেছ নিরবধি।
উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভরপুর
তোমরা তারুণ্যের স্পর্ধিত অহংকার
অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার
এগিয়ে যাবার অহংকার।

তোমরাই তো সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছ
পদাঘাতে ভেঙেছ পথের বাধা
ঢেলে দিয়েছ বুকের রক্ত
বিনাশ করেছ সকল গোলকধাঁধা।

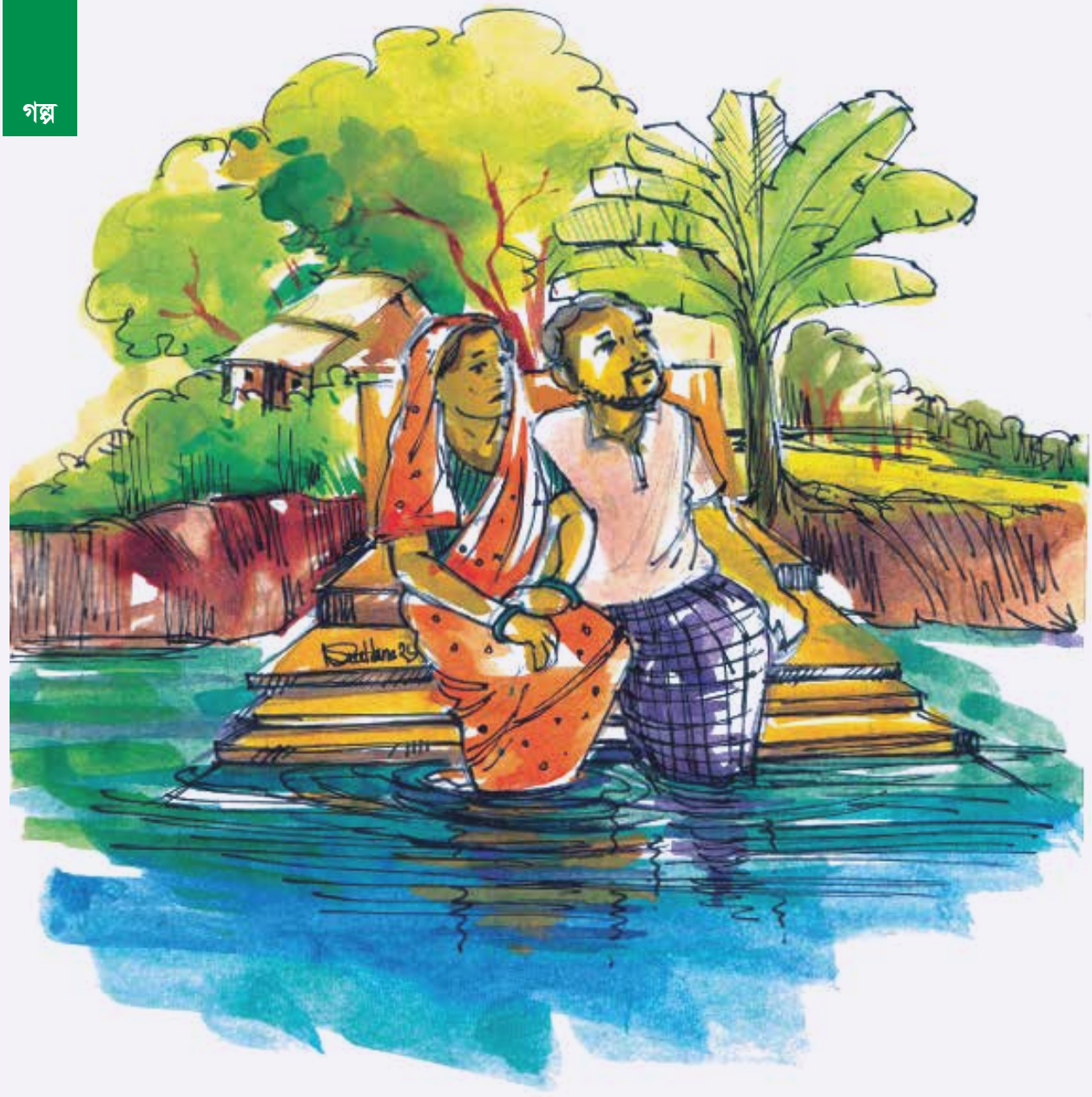

তিরিশ বছর পর

আবদুল গাফ্‌ফার সিকদার

ঘরে সেয়ানা মেয়ে থাকলে মা-বাবার চিন্তার কোনো অন্ত থাকে না। মেয়েটা কার ঘরে যাবে, জামাই ক্যামন হবে, দেবর-ননদ, শ্বশুর-শাশুড়ি তো আছেই। কিন্তু মজিদ খলিফা চিন্তায় পড়েছে তার একমাত্র পুত্র লতিফ খলিফাকে নিয়ে। তাকে বিয়ে করাতে হবে। মেয়েদের জন্য তার কোনো চিন্তা করতে হয়নি। তিন তিনটা মেয়েকে সে পটাপট বিয়ে দিয়ে ফেলেছে, কোনো রকম দিগদারি ছাড়াই। তার পর্দানশীল লজ্জাবতী মেয়েদের দেখে বর পক্ষ কালক্ষেপণ না করে তুক্কু দিয়ে নিয়ে গেছে।

রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিপণিবিতানে তো কত মেয়েই দেখা যায় কিন্তু কোনো মেয়েই মজিদ খলিফার পছন্দের ধোপে টেকে না। শুশ্রুমণ্ডিত মজিদ খলিফা রাস্তাঘাটে মেয়েদের দেখলেই কুতকুতিয়ে তাকায়। যেন সে দুরবিন লাগিয়ে ছেলের জন্য বৌ খোঁজে। ইদানীং সমস্যা হয়েছে বোরকা নিয়ে। গ্রামগঞ্জের অধিকাংশ মেয়েই নেকাব যুক্ত বোরকা পরে চলাচল করে। সে কারণেই বিনে পয়সায় কনে দেখা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে।

হাতে সময় আছে মাত্র এক মাস। সৌদি আরব থেকে দেড় মাসের ছুটিতে এসেছে লতিফ খলিফা। ইতোমধ্যেই পনেরো দিন শেষ। সুতরাং টালটিবালটি করে সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। চারদিকে লোক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড়ো মেয়ের জামাই মন্নাফ মুন্সী রীতিমতো কাছা দিয়ে ময়দানে নেমেছে। যে করেই হোক শ্যালকের জন্য কুটুমপাখি ধরে আনতেই হবে।

ছোটো মেয়ের জামাই খবর পাঠিয়েছে, কেওয়ার গ্রামে ভালো একটা মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। মেয়ে চয় চেহারায় গয় গঠনে মাশাল্লাহ দেখার মতো, উপরন্তু পর্দানশীল এবং মাদ্রাসায় পড়ুয়া। সুতরাং আর দেরি নয়। বড়ো ও মাইঝ্যা জামাইকে খবর দেওয়া হয়েছে। সেইসাথে শ্যালক আসলামকে। বহরে আরো যুক্ত হয়েছে মজিদ খলিফার বড়ো ভাই কাদির খলিফা, ভায়েরা ভাই রেহানউদ্দিন, মেয়েরা তো আছেই। মোটামুটি জনা দশেকের এক কমান্ডো অভিযাত্রী দল কনে দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত। ছোটো জামাই ইতোমধ্যে বেতকা বাজার থেকে মিষ্টি, ফলমূল, পানসুপারি কিনে এনেছে। কিন্তু দলের সদস্যসংখ্যার আধিক্য দেখে সে কিছুটা বিব্রত। তার সাথে কথা হয়েছিল চার-পাঁচজন যাবার। চার-পাঁচজনের জায়গায় ছয়-সাতজন হলেও চলে কিন্তু তাই বলে দশ?

শ্বশুর মিয়া উচ্চ স্বরেই বলতে থাকেন, আরে মিয়া আমরা তো আর খাইতে যাইতাছি না, বিয়ালে যামু সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরা আমু। মেয়ে দেখুম, চা-বিস্কুট খামু, পছন্দ অইলে কথা কমু, নাঅইলে পরে জানামু।

এত বড়ো বাহিনী দেখে কনে পক্ষ মোটেই অবাক হয়নি। কারণ ইতঃপূর্বেও কনে দেখাতে গিয়ে এ রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে। গ্রামে সাধারণত মামা, চাচা, খালু, ফুপা, দাদা, নানা, বন্ধু-বান্ধব হিসাব করতে গিয়ে তালিকটা দীর্ঘ হয়ে যায়। কাকে রাখবে, কাকে নেবে-এ রকম দোটানায় পড়ে সবাইকেই নিতে হয়।

কেওয়ার গ্রামের একটা ফাঁকা জায়গায় কনেদের বাড়ি। আশপাশের বাড়িঘরগুলো একটু দূরে। উঁচু ভিটা জমিতে নতুন বাড়ি করা হয়েছে। বাড়িতে নতুন টিনের ঘর, চারদিকে গাছপালায় ঘেরা, দক্ষিণে বড়ো পুকুর, উত্তরে বাঁশঝাড়। সকাল-সন্ধ্যা পাখির কিচিরমিচির ডাক শোনা যায়। ঘরের পিড়াগুলো মাটি দিয়ে মসৃণ করে লেপা। বেঁকি বেড়া দিয়ে ঘেরা উঠোন ঝাড়ু দিয়ে পাতামুক্ত ঝকঝকে করা হয়েছে। পড়ন্ত বিকেলে বরবাহিনী যখন কনের বাড়ি যাচ্ছিল জমিতে চাষরত প্রতিবেশী কৃষকদের বুঝতে আর বাকি থাকে না আজও সেই কনে দেখার পালা। মনে মনে তারা কামনা করে তবুও মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাক।

অতিথিদের বাংলা ঘরে বসতে দেওয়া হয়েছে। চৌকির উপর লাল রঙের ছাপা বেডশিট, পাশে বালিশ। নীচে টুল, মোড়া, চেয়ারে যে-যার মতো বসেছে। কনের চাচার সাথে আমন্ত্রিত অতিথিদের বাতচিত হচ্ছে। অমুক বাড়ির অমুককে চেনেন কি না, অমুকে ঢাকায় বড়ো চাকরি করে। তার সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘণ্টা আধেক কেটে যাবার পর প্রথমে শরবত পরে সেমাই ও লাল-সাদা রঙের জাল প্যাচ পিঠা, সেইসাথে পাটিসাপটা আর ঠক পিঠা দিয়ে সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়। মচর মচর শব্দ করে পিঠা লাটা খাবার করার পর বরের চাচা কাদির খলিফা কাকে যেন বললেন– এইবার মাইয়া দেহান। বহেন মুরুব্বি বহেন, মাইয়া তো অবশ্যই দেহামু। গরিবের বাইত আইছেন আর আইবেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কনের মামি কনেকে নিয়ে ধীরলয়ে বাংলা ঘরে প্রবেশ করে সবাইকে সালাম জানায়। লম্বা ঘোমটা দেওয়া কনের ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত সালাম সকলের কানে পৌঁছায় না। তাৎক্ষণিকভাবে মামিই বলে ওঠে– মাইয়া আপনেগো ছালাম দিছে। ওয়া আলাইকুম আস সালাম বলে সবাই ছালামের জবাব দেয়।

ঝুলে পড়া লম্বা ঘোমটার আড়ালে মেয়ের মুখশ্রী দেখা যাচ্ছিল না। কে যেন বলে ওঠে, ঘোমটাখানা সরান। সহকারী মামি কনের মাথা থেকে ঘোমটা সরিয়ে নেয়। অভিযাত্রীদের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠে, মেয়ের চুল দেখান। অমনি সহকারী চুলের খোঁপা খুলে দিলে এক লাফে চুল কোমরের নীচে নেমে আসে। সহকারী মামি এবার নিজেই বলে ওঠে, মাইয়া হাঁটাইয়া দেখবেন না, খোঁড়া না লুলা? কেউ কিছু বলার পূর্বেই মেয়েকে কয়েক কদম হাঁটিয়ে দেখানো হয়। ঘোমটাবিহীন অধোবদনে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর পুনরায় মামি তার ঘোমটা টেনে দেয়। লতিফ খলিফার তীর্যক দৃষ্টিতেও অধোবদনে থাকা কনের সম্পূর্ণ মুখশ্রী দেখা সম্ভব হয় না। পাশে বসা বড়ো দুলাভাইকে চিমটি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাতে ঘোমটা পুনরায় খুলে দেওয়া হয়। অবশেষে ঘোমটা খুলে দিলেও কন্যার অবনত মুখ আর ঊর্ধ্বমুখী হয়নি। এরপর শুরু হয় মৌখিক পরীক্ষা। মজিদ খলিফা বড়ো ভাই কাদির খলিফাকে উদ্দেশ করে বলেন, মিয়াভাই মাইয়ারে কিছু জিগান। কাদির খলিফা এবার নড়েচড়ে বসেন, আমি আর কী জিগামু, জামাইরা জিগাউক। না, না কাকা আপনে মুরুব্বি মানুষ, আপনেই জিগান, আপনের উপর কোনো কথা নাই। জামাইরা সমস্বরেই চাচাশ্বশুরের প্রতি এভাবে সম্মান জানায়। অতঃপর শুরু হয় ভাইবা। মা তোমার নাম কিগো? কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত হয়– মোসাম্মৎ শরীফা বেগম। উচ্চারিত শব্দাবলি সকলের কানে পৌঁছেনি বুঝতে পেরে সহযোগী মামি কিছুটা জোরেসোরেই বলেন– মোসাম্মৎ শরীফা বেগম। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ– বড়োই সুন্দর নাম। তোমার লেখাপড়া কদ্দুর? সহযোগীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়– মেয়ে মাদ্রাসায় পড়তাছে। অকুস্থলে আবার উচ্চারিত হয় মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। এরপর কোরান শরীফের দু-একটা সূরা পাঠ ও অন্যান্য টুকটাক প্রশ্ন শেষে– জামাইদের উপর হাওলা করে দিয়ে কাদির খলিফা বিরতিতে যান। ছোটো জামাই তো ঘটক, তার কোনো প্রশ্ন নেই। মাইঝ্যা জামাই বলেন, বড়ো দুলাভাই বলুক, হেয় আমাগো মুরুব্বি। ততক্ষণে মাথার ঘোমটা আবার মুখের উপর ঝুলে পড়েছে। শুরু হয় বড়ো জামাতার প্রশ্নাবলি– কও দেহি কোন সূরায় বিসমিল্লাহ নাই? কন্যা নীরব। কথা বলছেন সহযোগী মামি। আরো দু-একটা প্রশ্ন করতে উদ্যত হলে মজিদ খলিফা জামাইকে থামিয়ে দেন। থাউক জামাই আর কিছু জিগাইয়েন না। মাইয়া আমাগো পছন্দ অইছে। ভাইবা পরীক্ষা শেষ হবার পর শরীফা বেগম উঠে দাঁড়ায়। অমনি মজিদ খলিফা

বুক পকেট থেকে টাকা বের করে মেয়ের হাতে গুঁজে দেয়। ক্ষীণ কণ্ঠে সালাম জানিয়ে শরীফা বেগম অন্দরমহলে চলে যায়।

প্রথম পর্ব সমাপ্তির পর কেউ কেউ বাংলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আম গাছের নীচে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাড়িঘর নিরীক্ষণ করে। দু-একজন হাঁটতে হাঁটতে বাঁশঝাড় পেরিয়ে রাস্তায় নেমে এসে নিজেদের বদভ্যাস সেরে যথাশীঘ্র বাংলা ঘরে ফিরে আসে। ইতোমধ্যে চা-বিস্কুট, ফলমূল, মিষ্টি আর পানসুপারি চলে এসেছে। এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সবাইকে ডেকে হাজির করানো হয় দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে। চা-পান পর্বের উপসংহারে শুরু হয় আসল কথাবার্তা। মজিদ খলিফাই শুরু করেন– মাইয়া আমাগো পছন্দ অইছে। পোলারে আপনেরা যা জিগানের জিগান। না, না, পোলারে আর জিগানের কী আছে? পোলা আমাগো পছন্দ অইছে। আলহামদুলিল্লাহ, বলে মজিদ খলিফা বলেন, তাইলে এইবার দিন-তারিখ ধার্য করেন। হাতে আমাগো সময় কম, একমাস বাদেই ছেলে সৌদি আরব চইলা যাইব। ইত্যবসরে কেউ কেউ ক্যালেন্ডার অনুসন্ধান শুরু করে। কেউ বলে ওঠে, ঘরে যদি মোহাম্মদী পঞ্জিকা থাকে নিয়া আহেন। কনের ছোটো ভাই দ্রুত ঘর থেকে মোহাম্মদী পকেট পঞ্জিকা এনে মজিদ খলিফার হাতে দেয়। উভয়পক্ষের সম্মতিতেই খুঁজে খুঁজে জুতসই একটা তারিখ বের করে সম্ভাব্য বিয়ের দিন ধার্য করে। শত কথার ভিড়ে সহসা কিছুটা সময় সবাই যেন নীরব হয়ে যায়। কনের পক্ষ থেকে নীরবতা ভাঙেন কনের মামা মহসীন আলী। সম্প্রতি তিনি কোরিয়া থেকে দেশে এসেছেন। মেয়ে আপনাদের পছন্দ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদেরও ছেলে পছন্দ হয়েছে মাশাআল্লাহ। এবার দেনা-পাওনার বিষয়টা যদি ফাইনাল করতেন। কথাটা লুফে নিয়ে বড়ো জামাই বলেন–

দেনা-পাওনার কথা আর কী কমু, আপনেরা ছেলেমেয়েরে সাজাইয়া দিবেন। মেয়ের মামা ঢোক গিলে পুনরায় বলেন– বিষয়টা আরেকটু ক্লিয়ার করলে ভালো হয়। মহিলাদের ভেতর থেকে ছোটো মেয়ে বলে ওঠে– মেয়ে বিয়ে দিতে হলে কী কী লাগে আপনেরা জানেন না? আমরা চাইয়া নিমু কেন? এ সময়ে আরও দু-চারজনের বক্তব্য একসাথে উঠে আসলে একটা ক্রস কানেকশনের মতো হযবরল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিছুক্ষণ এলোপাতাড়ি কথা চলার পর মজিদ খলিফা সবাইকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই ফ্লোর নেন। উল্লেখ্য যে, মজিদ খলিফা কিন্তু জামাকাপড় তৈরির খলিফা নয়। খলিফা তাদের বংশীয় পদবি। মজিদ খলিফার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষাগত সার্টিফিকেট না থাকলেও দশ বারো বছর সৌদি আরব থেকে মনটা তার উদার হয়েছে।

নিজের মেয়েদের বিয়ে দিতে গিয়ে যেমন তাকে যৌতুক দিতে হয়নি, তেমনি নিজের ছেলের বিয়েতেও যৌতুক নেবেন না। কন্যার বাবা যেভাবে কন্যারে উঠিয়ে দিতে চান সেভাবেই তিনি বৌকে ঘরে তুলবেন। এ বক্তব্য শোনার পরও কনেপক্ষের দ্বিধা কাটে না। এত সহজে মেয়েকে তারা নিয়ে যাবেন কথাটা যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

তাহলে এই কথাই রইল বলে মজিদ খলিফা চৌকি থেকে নেমে বিদায় নিতে যান। কিন্তু কনেপক্ষ তাদেরকে এই মুহূর্তে বিদায় দিতে নারাজ। চারটা ডাল-ভাত না খেয়ে যেতে পারবেন না বলে কনের বাবা ও মামা বরপক্ষের কয়েকজনের হাত চেপে ধরেন। কিন্তু মজিদ খলিফা তার সিদ্ধান্তে অটল। শত অনুরোধ উপেক্ষা করে শেষমেষ মজিদ খলিফা তার বাহিনী নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। বাড়ি এসেই তিনি দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। আজ যেন তার মাথা থেকে চিন্তার এক বিশাল বোঝা নেমে গেল।

নির্দিষ্ট তারিখে সহিসালামতে তাদের শাদি মোবারক সম্পন্ন হয়। সেদিনও মজিদ খলিফা দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানান।

বৌ নিয়ে বাড়ি আসার পর আশপাশের অনেকেই দেখতে আসে। কেউ মন্তব্য করে বৌর নাকটা একটু মোটা, কেউ বলে বৌ দেহি পাটকাঠি। কেউ আবার বলে বিয়ার পানি পাইলে সব ঠিক হইয়া যাইব। তবে বৌর রং নিয়ে সকলেরই অভিন্ন মত, শুনছি বৌ নাকি ফর্সা, কৈ বৌ দেহি শ্যামলা। পাড়া-প্রতিবেশীদের ফিসফাস গুঞ্জন শুনে লতিফ খলিফার মা কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাড়াহুড়োর মধ্যে তিনিও ভালো করে বৌ দেখেননি। পরদিন মধ্যাহ্নে প্রখর সূর্যালোকে বৌকে কাছে টেনে তিনি গভীরভাবে অবলোকন করে প্রতিবেশীদের মন্তব্যের যথার্থতা খুঁজে পান। বিষণ্ন মন নিয়ে আড়ালে মেয়েদের জিজ্ঞেস করেন, তরা না কইলি মাইয়া ফর্সা। মাইয়া দেহি শ্যামলা। তাইলে কী দেখলি তরা? মায়ের কথা শুনে মেয়েরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। আমাগো কাছে তো ফর্সাই মনে হইছিল। কী জানি কী দেখলাম, কী অইল! রাতে ছোটো মেয়ে স্বামীর সাথে ফিসফিস করে আলাপ করে– তুমি কি মাইয়া আগে দেখছিলা না। আমি তো তোমাগো লগেই দেখলাম। সেদিন কি মাইয়ারে ফর্সা মনে অইছিল না? হ, ফর্সাই তো দেখলাম।

কিন্তু এহন দেখি রং শ্যামলা। মনে হয় চুনকাম কইরা ফর্সা অইছিল। বাদ দেও, বিয়া অইছে এহন আর এসব চিন্তা কইরা লাভ নাই। স্ত্রীকে এভাবে বলার পরও জামাইর মনে ক্যামন যেন একটা খটকা লাগে। তবে কি এই কারণেই মাইয়া এত লম্বা ঘোমটা দিয়া আছিল?

বাড়ির লোকজনের কানাঘুষা, ফিসফাস শরীফা বেগমের দৃষ্টি এড়ায় না। তার রঙের দুর্বলতা যেমন তাকে বিমর্ষ করে তেমনি আতঙ্কিত করে তার অস্তিত্বের কথা ভেবে। সংসার জীবনে টিকে থাকার লক্ষ্যে যা যা করণীয় তার সবই তাকে করতে হবে। এ দৃঢ়প্রত্যয় তাকে উজ্জীবিত করে।

হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা দিয়ে স্বামীকে সে পরিতৃপ্ত করে। শ্বশুরের কখন কী প্রয়োজন– তার অজুর পানি এগিয়ে দেওয়া,

যথাসময়ে তাদের খাবার পরিবেশন, শাশুড়ি গোসলের কাপড় নিজ হাতে পরিষ্কার করা, বাড়ির সমস্ত কাজ একের পর এক সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করে ধীরে ধীরে সকলের মনকে জয় করে নেয় শরীফা বেগম। যারা এক সময় তার রঙের দুর্বলতা নিয়ে নানা কথা বলত এখন তারাই শরীফার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

স্ত্রীর আচার-ব্যবহারে লতিফ খলিফা যারপরনাই খুশি। এমন সুখের খনি ছেড়ে মরুভূমির তপ্ত ভূমিতে তার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু যথাসময়ে না গেলে তো চাকরি হারাতে হবে। অগত্যা শরীফা বেগমই তাকে ঠেলেঠুলে সৌদি আরব পাঠিয়ে দেয়।

বিয়ের পরে আরও পাঁচটি বছর মরুর দেশে কাটাতে হয় লতিফ খলিফাকে। অবশ্য প্রতিবছরই এক মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি আসা হয়েছে। গত পাঁচ বছরে তাদের সংসারে দু দুটি সন্তান এসেছে। স্বামী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে তাদের ঈর্ষণীয় সুখের সংসার। একে একে পেরিয়ে গেছে তিরিশটি বছর। জগৎ-সংসারে কতনা অভাবিত পরিবর্তন হয়েছে এর মাঝে। লতিফ খলিফা, শরীফার চুলেও পাক ধরেছে, অর্জিত হয়েছে তাদের দাদা-দাদির খেতাব। হঠাৎ একদিন খবর আসে শরীফার চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রী রহিমা বেগম গুরুতর অসুস্থ। কালবিলম্ব না করে স্বামীকে নিয়ে শরীফা বেগম মীরগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হয়। বেতকা বাজারের কাছে আসতেই জানা গেল রহিমা বেগম চলে গেছে না ফেরার দেশে। খবরটা শুনেই শরীফার মাথাটা ঝিমঝিম করে, চোখ দুটো যেন অন্ধকার হয়ে আসে। স্বামীকে কিছু বলার আগেই সে জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। আচমকা এমন পরিস্থিতিতে লতিফ খলিফা দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। পথচারী দুজন মহিলা ধরাধরি করে শরীফা বেগমকে রাস্তার পাশের এক বাড়িতে পৌঁছে দিলে মহিলারা টিউবওয়েল চেপে মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালতে থাকে। কেউ কেউ চোখেমুখে পানির ঝাপটা দেয়। প্রায় মিনিট দশেক পর শরীফা বেগম চোখ মেলে তাকায়, মহিলাদের সহযোগিতায় আস্তে আস্তে সে উঠে বসে। কে একজন আঁচল দিয়ে তার মাথা-মুখ মুছে দেয়। এ অবস্থায় এত মানুষ দেখে সে লজ্জা অনুভব করে। হাত ধরে রাখা স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করে এখন কেমন লাগতাছে শরীফা? কিছু না বলে ইশারায় সে পানি খেতে চায়। ঘণ্টাখানেক পার হবার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তারা মীরগঞ্জে গিয়ে পৌঁছে। এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের মাঝে রহিমা বেগমের নির্বাক মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে শরীফা। লতিফ খলিফার আশঙ্কা হয় না জানি শরীফা আবার জ্ঞান হারায়। তাই দ্রুত তাকে সরিয়ে নিয়ে ঘরের ভেতর শুইয়ে রাখে।

মৃতকে কবরস্থ করে সেদিন রাতেই তারা বাড়ি ফিরে আসে। ক্লান্ত, অবসন্ন লতিফ খলিফা দ্রুতই ঢলে পড়ে গভীর ঘুমে। ঘুম আসে না শরীফা বেগমের। সারাটা রাত কেঁদে কেঁদে তার চোখমুখ ফুলে গেছে। কী এক অব্যক্ত বেদনায় বিষণ্ন, বিমর্ষ শরীফা বেগম নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। নিস্তব্ধ গভীর রাতে নিদ্রামগ্ন স্বামীকে সে জাগিয়ে তোলে। স্ত্রীর বিধ্বস্ত মুখচ্ছবি দেখে লতিফ খলিফা ভয় পেয়ে যায়, না জানি শরীফা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। খুবই ধীরস্থিরভাবে শরীফা বেগম স্বামীর হাত ধরে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে তারা পুকুর পাড়ের আমগাছের নীচে পাতা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে। সুনসান নীরব রাত। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু দু-একটা নিশাচর পাখির হালকা ডাক শোনা যায় দূর থেকে। চারদিকে মিহি কুয়াশার অস্তিত্ব থাকলেও দূর আকাশের গ্রহ নক্ষত্র থেকে ঠিকরে পড়া আলোয় একে অপরকে দেখতে পায়। বিস্ময়ে বিমূঢ় লতিফ খলিফা ভাবতে থাকে আজ একি হলো শরীফার, ও কেন এমন করছে! সহসাই শরীফার শীতল দুটি হাত লতিফ খলিফার হাত দুটোকে শক্ত করে বুকের কাছে আটকে রেখে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। চোখের তপ্ত নোনা জলে লতিফ খলিফার হাত দুটো সিক্ত হয়ে যায়। কী হইছে শরীফা, তুমি এমন করছ কেন? সহসা শরীফা সরব হয়ে ওঠে। সারাটা জীবন আমি জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়েছি, কিন্তু বলতে পারিনি কোনোদিন। আজ আমি সে-কথাই তোমাকে বলব। লতিফ খলিফা ভাবতে থাকে তবে কি আমার আচরণে শরীফা অসন্তুষ্ট– নাকি প্রবাসজীবনে থাকাকালীন মা-বাবা ওকে কষ্ট দিয়েছে।

ভেবে ভেবে কোনো কারণই সে খুঁজে পায় না। স্বামীর হাত দুটো আরও শক্ত করে চেপে ধরে শরীফা বলে ওঠে– আমারে কথা দাও তুমি আমারে মাফ কইরা দিবা। কেন, তুমি কী অপরাধ করছ আমার কাছে? আমি তো অপরাধ দেখি না। পুরা সংসারটা তুমি আগলাইয়া রাখছ, বাবা-মাকে তুমি সেবা করছ, তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট। স্বামীর কথা শুনে আবারও সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে শরীফা পুনর্বার স্বামীর কাছে মিনতি জানায়, তুমি কথা দাও– তুমি আমারে মাফ কইরা দিবা। ঠিক আছে, তুমি কও কী কইবা, আমি তোমারে মাফ কইরা দিমু। এরপর শরীফা বলতে থাকে– তিরিশ বছর আগে তোমরা যেদিন আমারে দেখতে গেছিলা সেদিন আমার বদলে কনে সাইজ্জা তোমাগো সামনে হাজির হইছিল রহিমা ভাবি। আমারে তোমরা দ্যাহো নাই। আমার গায়ের রং শ্যামলা বইলা বহু সম্বন্ধ ফিরা গেছে। সেই জন্যই এই অন্যায় কাজটা ভাবি আমার জন্য করছে। কও, তুমি আমারে মাফ কইরা দিবা, ভাবিরেও মাফ কইরা দিবা। বিস্ময়ে হতবাক লতিফ খলিফা অপলক দৃষ্টিতে শরীফার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ততক্ষণে রাত প্রায় শেষ হবার পথে। তখনই মসজিদ থেকে ফজর নামাজের আজানের ধ্বনি নিস্তব্ধ রাতের নীরবতা বিদীর্ণ করে কানে এসে পৌঁছায়। লতিফ খলিফা শরীফা বেগমকে জাপটে ধরে বলে, চলো এবার ঘরে যাই। ধীরে ধীরে পূর্বাকাশ ফর্সা হতে থাকে। পাখিরাও ডেকে ওঠে গাছের শাখায়। লতিফ খলিফা ত্রস্তপদে মসজিদের দিকে পা বাড়ায়।

মুগ্ধ এ দেশময়

গোবিন্দলাল সরকার

পানি লাগবে পানি!
বলুন তো কার বাণী
নেই কোনো যার ভয়
তার মরণ কী সয়।
নামটি মুখে মুখে
দুঃখ সবার বুকে
গর্ব মায়ের হয়
সে সাধারণ নয়।
ইতিহাসের নতুন খাতায়
গুণ লেখা তার লব্ধ পাতায়
মুগ্ধ এ দেশময়
জয় জনতার জয়।

তবু যে আষাঢ়

সেহাঙ্গল বিপ্লব

মেঘের আড়ালে চাপা ছিল তার রূপ
বৃষ্টি এমন মুচকি হাসতে পারে !
বর্ষার রূপে অপরূপ আফ্রোদিতি
ভেনাস কিংবা হেলেন হতেও পারে।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীরন্দাজের মতো
ঠোঁটের আগুন হৃদয়ে বাড়ায় ক্ষত
না এলে বৃষ্টি পৃথিবী জ্বলবে রোদে
মাটির শরীরে তাপদাহ ওঠে বেড়ে।

মেঘের চিহ্ন হৃদয়ে খুঁজেছি কত
মেয়েটি বলেছে আকাশের নীলে যেতে
তার হাসিতেই ফুটুক সূর্যমুখী
তোমাদের শুধু রোদের বার্তা দেবো।

আষাঢ়ে ভিজবে শুকনো কদম ফুল
তবুও বৃষ্টি সহজে আসে না ফিরে
উষ্ণতা গেছে সবখানে খুব বেড়ে
মুচকি হাসির রোদ্দুর আসে তেড়ে!

বৃষ্টি আমার পছন্দ খুব জানে
সেই সাথে ভেজা কদম ফুলের ঘ্রাণ
এসব তোমার রূপকথা মনে হবে
হঠাৎ বৃষ্টি শব্দ টিনের চালে।

বৃষ্টিই জানে বিরহের রূপরেখা
মেঘমল্লারে করুণ সুরের গান
ভেজাতে আসবে আবার চোখের কোণ
বৃষ্টি আমার একান্ত প্রিয়তমা।

নিয়মের চলাচল

আবু জাফর আবদুল্লাহ্

সাগর কূলে বাঁধিনি বাসা
বেঁধেছি নদীকূলে।
আমার বসত বাড়ি থেকে সাগর
বড়ো একটা দূরে নয়।
নিশ্চিত রাতে নিস্তব্ধতা নেমে এলো
সাগরের গর্জন শুনতে আধো ম্রিয়মাণতায়।
কখনোবা অতি শব্দে।
আমি জেগে থাকি চোখের আর্শিতে
ঘুম আসে না তাই।
এতেও একটা শান্তি আছে।
সাগরের জল থেকে ভেসে আসা
স্নিগ্ধতা নিয়ে প্রায় রাতেই।
এতেও কি ভিজে মন প্রেয়সীর স্পর্শ ছাড়া।
যেমন ভিজে না গাছেরা কুয়াশার বৃষ্টি ছাড়া।
তাই তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে সারাক্ষণ।

বর্ষার রেখাচিত্র

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

জলের রেণু হাওয়ায় ভাসে, মেঘের ফোঁটা স্বপ্ন আঁকে
রঙিন ছাতা উড়ছে দূরে, অচিন পাখির ডানায় মাখে।
বৃষ্টির ফোঁটা গলে পড়ে, দেয়াল জুড়ে সবুজ শেওলা
আঁধার ক্যানভাসে ছবি, ধুয়েমুছে নেয় সকল ময়লা।

জ্বলে নীলচে বিদ্যুতের শিখা, কাঁপন তোলে গভীরে
শহরের ইট-কাঠের ভিড়ে, ছায়ার খেলা আঁধারে।
ভিজে মাটির গভীর ঘ্রাণ, পরাবাস্তব এক সুর
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো, যেন কোনো এক সুদূর।

অজানা এক স্বপ্ন-নদী, ঢেউ খেলে যায় অবিরত
ক্লান্ত পথিক পথ হারায়, একাকী সে-ই রয় গত।
বৃষ্টির সুরের মূর্ছনা, কানে বাজে সেই অজানা ভাষা
কোন সে সুরের অতল গহ্বরে, লুপ্ত হয় সব আশা।

জানালার কাচের ওপারে, হাসে শহরের নিয়ন আলো
মিশে যায় বৃষ্টির জলে, বিভ্রমের জাল বোনে ভালো।
ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে, জমে আছে কত কথা
অবাস্তব এক দৃশ্যপট, নীরবতার বুকে হাজার গাঁথা।

বৃষ্টি আর আমি একা, খুনসুটি এই পরাবাস্তব রাতে
ভেসে যায় সব বাস্তবতা, এক অচেনা স্রোতের সাথে।

ডাউকি ব্রিজের এ পাশ থেকে

চন্দনকৃষ্ণ পাল

মেঘালয়ের সুপুরি বন ডাক পাঠালো
তাকাই, দেখি ডাউকি ব্রিজে একাই তুমি
এগিয়ে যাই, বাধা দিলো উর্দিধারী
এগিয়ো না, ওটাই তোমার নিজের ভূমি।
মনের ভেতর কালো মেঘের আনাগোনা
ডাউকি ব্রিজে উড়ছে তোমার শাড়ির আঁচল
লাইমস্টোনের চাঙ্গড় নিয়ে ছুটছে গাড়ি
পাহাড় ভেঙে নামছে জোরে দুধসাদা জল।
বারকি নায়ে জোড়ায় জোড়ায় নৌবিহারে
লক্ষ পাথর জলের নীচে গুমড়ে কাঁদে
একা আমি এ পাশ থেকে যাই দেখে যাই
ফেঁসে গেছি একটি সিলের কঠোর ফাঁদে।
পাতার গায়ে সিল লাগেনি, হতাশ আমি
বোকার মতো আকাশ বাতাস সবুজ দেখি,
মানুষ নাকি শ্রেষ্ঠ, সেরা? কে দেয় লেবাস?
আসলে তা ভণ্ডামি আর ভয়াল মেকি।
ভালোবাসার মাঝেই ওসব মুর্খগুলো
জাল বিছিয়ে, কাঁটাতারে বন্ধ রাখে
চোখের জলে বুকের জলে ঝরনা যে হয়
নীলচে সাদা ক্যানভাসটা দাঁড়িয়ে থাকে।
কেউ বুঝে না কেউ দেখে না সেই সে আঁচল
ঝরনা ছুঁয়ে এগিয়ে যায় দুধসাদা জল ...।

হবে জয় সত্যের নিশ্চয়

মিতা চক্রবর্তী

সত্য-অসত্যের লড়াইয়ে
অসত্য কী আশ্চর্য শক্তি নিয়ে বুক ফুলিয়ে দম্ভ করে!
তাজা তাজা মিথ্যের ফুলঝুরি আর রঙিন ফানুসে
বিভ্রান্ত করে শত সহস্র হৃদয়কে
সাদামাটা সত্য ফ্যালফ্যাল নয়নে তাকিয়ে থাকে
অদূর ভবিষ্যতের দিকে-
হবে জয়- এ প্রত্যাশায়!
থোকা থোকা সন্দেহ মিশ্রিত কটুবাক্য
বিশ্বাসের বলিষ্ঠ প্রাচীরকেও নড়বড়ে করার ঔদ্ধত্য দেখায়
অপরিমেয়-অপ্রমাণযোগ্য-অদৃশ্য সত্য
ঝিমিয়ে যায়-নেতিয়ে পড়ে- মিষ্টি আভাযুক্ত মিথ্যের আভায়।
ভুল যখন হুল ফোঁটায় সাজানো হৃদয়ে
নীরব অপ্রতিরোধ্য রক্তক্ষরণ তখনও অদৃশ্যই থেকে যায়
অমীমাংসিত কিছু আশা নিয়ে
শুধু চেয়ে থাকা
ভবিষ্যতের জানালায়।
হয়ত হবে জয়, সত্যেরই নিশ্চয়ই
সত্যেরই নিশ্চয়, হবে হবেই জয়।

ইচ্ছে আমার

সমীরণ বড়ুয়া

আকাশটা কি চায় কখনো
কালো মেঘে থাকতে,
আমার ভীষণ ইচ্ছে করে
ফুল পাখি সব আঁকতে।

ফুল বাগিচায় টগর বেলি
তাকিয়ে দেখি জুঁই চামেলি,
কাঠ গোলাপের সুগন্ধে আজ
অলির মতো উড়তে,
ইচ্ছে করে টিয়ের মতো
ডানা মেলে ঘুরতে।

নীল দরিয়ায় নীলে নীলে
তিমি, হাঙ্গর সাথে মিলে,
সাত সমুদ্দুর ভাসতে,
জল পরী ও নীল পরীদের
পিঠে বসেই হাসতে।

হিমালয়ের পাহাড় চূড়ায়
মেঘ বালিকা নয়ন জুড়ায়,
অরুণ আভায় হিম গিরিতে
বরফ হয়ে গলতে,
সকল বাঁধা পেরিয়ে ভাই
বীরের মতো চলতে।

প্রজাপতির রঙিন পাখায়
ফুলের বনে রিক্ত শাখায়,
সাত সকালে ফুটতে,
মাথার ওপর সাত গগনে
গ্রহান্তরেই ছুটতে,
রংধনু রং আবির ছড়ায়
দূর আকাশে ওঠতে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খান

শফিকুল ইসলাম

দেশবরেণ্য ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খান আর নেই। ২০শে জুলাই রাজধানীর বেসরকারি একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

হামিদুজ্জামান খান ১৯৪৬ সালের ১৬ই মার্চ কিশোরগঞ্জের সহশ্রাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান চারুকলা অনুষদ) থেকে চারুকলায় স্নাতক ডিগ্রি নেন। পাঠ পর্ব শেষে তিনি ১৯৭০ সালে ঢাকা চারুকলার ভাস্কর্য বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ফর্ম, বিষয়ভিত্তিক ও নিরীক্ষাধর্মী ভাস্কর্যের জন্য তিনি সুপরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত একাত্তর স্মরণে শীর্ষক কাজের জন্য তিনি ভাস্কর হিসেবে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী সিউলে অলিম্পিক ভাস্কর্য পার্কে ভাস্কর্য স্থাপনের মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিতি অর্জন করেন।

১৯৭২ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ভাস্কর আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে তিনি জাগ্রত চৌরঙ্গী নামে একটি ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য কাজ করেন। গাজীপুরে জয়দেবপুর চৌরাস্তার মোড়ে স্থাপিত এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে সার কারখানায় 'জাগ্রতবাংলা', জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংশপ্তক', ঢাকা সেনানিবাসে 'বিজয় কেতন', মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন প্রাঙ্গণে 'ইউনিটি', কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে 'ফ্রিডম', উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্বাধীনতা চিরন্তন', আগারগাঁওয়ে সরকারি কর্মকমিশন প্রাঙ্গণে 'মৃত্যুঞ্জয়ী', মাদারীপুরে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' হামিদুজ্জামান খানের অন্যতম বহিরাঙ্গণ ভাস্কর্য।

তবে বাংলাদেশে হামিদুজ্জামান খান জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতি লাভ করেন বঙ্গভবনের প্রবেশপথে ফোয়ারায় স্থাপিত পাখি পরিবার শীর্ষক ভাস্কর্যের মাধ্যমে। ২০০৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনুরোধে তিনি শান্তির পাখি নামে একটি ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। এটি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সম্মুখে স্থাপিত হয়েছে।

ভাস্কর্য ছাড়াও হামিদুজ্জামান খান তাঁর চিত্রকর্মের জন্যেও সুপরিচিত। হামিদুজ্জামান খানের জলরং ও অ্যাক্রিলিক চিত্রকর্মে বিমূর্ত প্রকাশবাদের ধারা লক্ষ করা যায়। তাঁর চিত্রকর্মের প্রধান বিষয়বস্তু নিসর্গ ও মানব শরীর। ভাস্কর্যের পাশাপাশি জলরং, তেলরং, অ্যাক্রিলিক, স্কেচ মাধ্যমে সমানতালে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পর ভাস্কর্যে তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল পাখি। ঢাকার বুকে ব্রোঞ্জ ও ইস্পাতের তৈরি বেশ কিছু পাখি তার শিল্পী সত্তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

হামিদুজ্জামান খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে ২০১২ সালে অবসর গ্রহণের পর থেকে স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা করে গেছেন। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হামিদুজ্জামান খান রেট্রোস্পেকটিভ নামে ১৯৬৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম নিয়ে একটি প্রদর্শনী আয়োজন করে। এতে প্রায় ৩০০টি ভাস্কর্য এবং ২৫টি চিত্রকর্ম উপস্থাপন করা হয়। ২০১৮ সালে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হামিদুজ্জামানের কর্মজীবন ও তাঁর পাঁচ দশকের শিল্প সাধনার প্রতি সম্মান জানিয়ে 'হামিদুজ্জামান ভাস্কর্য পার্ক' নামে একটি ভাস্কর্য উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী হামিদুজ্জামান খান ২০০৬ সালে শিল্পকলায় অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদকে ভূষিত হন। তিনি বাংলা একাডেমি ফেলো ছিলেন। এছাড়া তিনি দেশ-বিদেশে বহু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের পুরস্কার, জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (১৯৭৬); শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পুরস্কার, জীবন-ভিত্তিক শিল্পকর্মের প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (১৯৭৬); ঢাকা শহরের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (২০০৬); ভাস্কর্যে অবদানের জন্য একুশে পদক (২০০৬); এস এম সুলতান স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (২০১২); জয়নুল সম্মাননা ২০১৯, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৯) উল্লেখযোগ্য।

হামিদুজ্জামান খান মৃত্যুকালে স্ত্রী ভাস্কর আইভি জামান, দুই পুত্র ও দেশ-বিদেশে অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। প্রথিতযশা ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী হামিদুজ্জামান খানের প্রথম জানাজা ২০শে জুলাই আসরের নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে জুলাই দুপুরে নামাজে জানাজা শেষে তাঁকে কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার সহশ্রাম গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। এর আগে আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ ১৪ই জুলাই ২০২৫ ঢাকায় জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে 'জুলাই কন্যা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জুলাই কন্যাদের নিয়ে রিকশা র‍্যালি শেষে আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 46, No. 01, July 2025, Tk. 25.00

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে ১৫ই জুলাই ২০২৫ ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদমিনার প্রাঙ্গণে ড্রোন শো অনুষ্ঠিত হয়– পিআইডি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd